স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ১৭ সেপ্টেম্বর - ২০১২।। ৩১ ভাদ্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

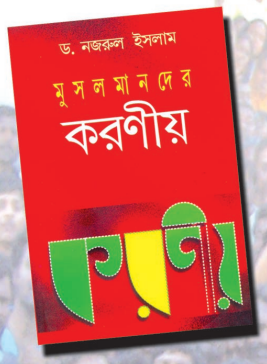

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক ইস্কন

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

রাজ্যের মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নজরুল □ ৯

রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে? □ ১০

খোলা চিঠি : ওড়াব কিন্তু কাটব না □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

দুর্বৃত্তের দুঃশাসনে দুর্বিপাকে দেবভূমি □ ডঃ স্বরূপ ঘোষ □ ১২

রাজ্যের আই পি এস অফিসার নজরুল ইসলামের বই :

'মুসলমানদের করণীয়'র আড়ালে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন □ বিজয় আঢ্য □ ১৪

তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস একজোট; আলিগড় হবে

আহিরণে : চাই মুসলিম ভোট □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৬

নন্দীগ্রামের নাম এখন 'আহিরণ' □ ১৮

পৌরাণিক নগর হস্তিনাপুর □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২১

গণেশ : এই সময়ের চোখে □ রমাপ্রসাদ দত্ত □ ২২

সিদ্ধিদাতা গণেশ □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৩

সেচ বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্তা বাঙালি তনয়া □ ইন্দিরা রায় □ ২৬

ইউ পি এ-র সঙ্কটে অন্যরা কি প্রস্তুত? □ ডঃ জে কে বাজাজ □ ২৮

জন্মেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ : অথঃ কমিউনিস্ট

চরিত্রকীর্তন □ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী □ ৩০

বাংলাদেশের আয়নায় : দিনাজপুরে হিন্দু গ্রামে হামলা :

দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি □ ৩২

রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির দিকে রাজ্য সরকারের

নজর নেই কেন? □ গোপীনাথ দে □ ৩৬

নেহরু কাপ জয় একটা পরিবর্তনের সূচনা □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম: ২৭ □

প্রাসঙ্গিকী : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৭ সেপ্টেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

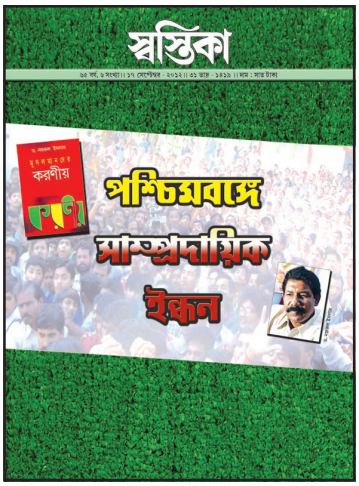

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন :
পৃ- ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

ট্যাঁড়শ

যিনি নিজে 'অকর্মার ঢেঁকি' হইয়া অপরের কাঁধে দোষ চাপাইতে সিদ্ধহস্ত তাহাকে 'নিকম্মা' বা ট্যাঁড়শ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। আমেরিকার সংবাদপত্র তাহাকে 'ট্র্যাজিক ফিগার' বলিয়াছে। দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত একটি সরকারের নেতৃত্বে রহিয়াছেন তিনি। আট বছর ধরিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকিয়াও কেবল চৌর্য কর্মে সহায়তা ছাড়া অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারেন নাই তিনি। কয়লা দুর্নীতি কেলেঙ্কারী লইয়া বিরোধী এন ডি এ দলের প্রতিবাদস্বরূপ সংসদ অচল করিবার প্রতিবাদকে তিনি গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নাকি সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। দেশবাসী তথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতি তিনি আবেদন করিয়াছেন সংসদে বিরোধীদের এই ধরণের আচরণের প্রতিবাদ করিতে। অথচ কিছুদিন পূর্বেই দেশবাসীর প্রতিনিধি হইয়া যখন আন্না হাজারে ও বাবা রামদেব সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করিয়াছিলেন তখন তিনিই সমালোচনা করিয়াছিলেন। দেশের সুচিন্তিত নাগরিকবৃন্দ যখন ইউ পি এ সরকারের দুর্নীতি লইয়া প্রতিবাদ করেন তখন তিনিই কটাক্ষ করেন। তাই তাঁহার দেশবাসী তথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান করিবার কোনও অধিকার নাই; ইহা দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামিরই নামান্তরমাত্র। আজ তিনি বলিতেছেন, 'দাবি উঠুক সংসদের গতি স্বাভাবিক রাখিয়া কাজ করিতে দেওয়ার'। কিন্তু দুর্নীতি দূর করিবার এবং বিদেশে রক্ষিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়া আনিবার যে দাবি সারাদেশে প্রথমে উঠিয়াছে তাহার কী সুরাহা হইবে? প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, এই অধিবেশনে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। কিন্তু বিরোধী নেত্রী বলিয়াছেন, প্রতিবাদ বিক্ষোভ গণতন্ত্রের একটা অংশ। সংসদের কাজকর্ম অচল করিয়া রাখাও গণতন্ত্রের অন্যান্য পন্থার মতো একটি পন্থা। ইহা সত্য কারণ আজকের প্রধানমন্ত্রী যখন এন ডি এ আমলে রাজ্যসভার নেতা ছিলেন তখন তাঁহারাও তহলকা-ইস্যুতে সংসদ অচল করিয়াছিলেন। কফিন কেলেঙ্কারি লইয়া তাঁহারা ২১ দিন সংসদ অচল করিয়াছিলেন। জর্জ ফার্নান্ডেজকে বলিয়া ছিলেন কফিন চোর। আজ কয়লা চোর হইয়া তাঁহারা বড় বড় নীতিবাক্য শুনাইতেছেন কেন? তাঁহাদের মনে রাখা উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেই লুঠ করিবার ছাড়পত্র পাওয়া যায় না। সংসদ অচল করিবার প্রসঙ্গে বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা কোকরাঝাড় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। সরকার খুবই সাধারণ জবাব দিয়াছে। সিএজির রিপোর্ট পেশ হইবার পর মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। সরকার বলিয়াছে আলোচনা, আমরা বলিয়াছি পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ তাহার পর আলোচনা। যখন সংসদ অচল অবস্থায় শেষ হইয়াছে তখন বলা হইতেছে বিরোধীরা এত কোটি টাকার ক্ষতি করিয়াছে!' দুর্নীতি যখন ধরা পড়িয়াছে তখন অপরাধীকে শাস্তি দিবার বদলে কিসের আলোচনা তাহাই বোধগম্য নয়!

বিরোধী নেত্রী বলিয়াছেন, টুজিতে সরকার ১,৬০০ কোটি টাকা দিয়া লাইসেন্স বিলাইয়াছিল। এন ডি এ দলের প্রতিবাদের ফলে এখন যে ন্যূনতম দাম ধরা হইতেছে তাহাতে দেশের কোষাগারে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা আসিবে। আজ ২০ কোটি টাকা ক্ষতি করাইয়া যদি এই ভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায় তাহাতে অসুবিধা কোথায়? বরঞ্চ শেষে লাভই হইবে। রাজ্যসভার বিরোধীনেতা অরুণ জেটলিও বলিয়াছেন, তিন বছর পূর্বে এই ভাবেই প্রতিবাদ করিয়া টেলিকম ক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করা হইয়াছে। এইবার প্রতিবাদ করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টনের বিষয়টিকেও দুর্নীতিমুক্ত করা যাইবে।

সকলেই চায় সরকারের একটি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকুক। কিন্তু এই সরকার সমস্ত দায়বদ্ধতা এড়াইতেই তৎপর। সেজন্যই বিরোধীদের কাঁধে দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু সাজিবার প্রচেষ্টা।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধ হয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, সমাজসংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই ধর্মের ভিতর দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলটদের চীনা মন্ত্রীর ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা কি পরিকল্পিত?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দু' জন ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলটকে নজিরবিহীনভাবে ১ লক্ষ টাকা করে বখশিস দিয়ে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছেন চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা জেনারেল লিয়াং গুয়াংগলি। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই ঘটনাটিকে আদৌ তাৎক্ষণিক কোনও হালকা চালের কাজ বলে মেনে নিতে পারছেন না। উল্লেখ্য, তিন জন চীনা বিশেষজ্ঞ ও জনৈক অবসরপ্রাপ্ত চীনা সরকারি আধিকারিকের মতামত অনুযায়ী এই ধরনের কাজের পেছনে অবশ্যই অত্যন্ত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী মতলব রয়েছে। এটি কখনই মুহূর্তের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এটি পরিকল্পিত উপায়ে ভারতের অভ্যন্তরে একটা অস্থিরতা তৈরির নিশ্চিত অপকৌশল।

অবসরপ্রাপ্ত চীনা সরকারি আধিকারিকটিকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা জানাচ্ছে— তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোনও চৈনিক নেতাকে অন্য কোনও দেশের সামরিক আধিকারিকদের নগদ টাকায় বখশিস দেবার হিম্মত দেখানোর কথা শোনেননি বা জানেন না।

চীনা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দলের সাম্প্রতিক ভারত সফরান্তে দেশে ফেরার পর নিয়মমাফিক বিদেশ দপ্তরের মিডিয়া ব্রিফিং হয়। উপস্থিত প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র এ সংক্রান্ত বিশদ না জানার কথা ব্যক্ত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফরকে 'সফল' বলে অভিহিত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কূটনৈতিকভাবে দীর্ঘদিনের চৈনিক বিদেশনীতি অনুশীলন করা বিশেষজ্ঞরা

মনে করেন, আফ্রিকার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে 'ঘুষ' একটা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। আবার অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, চীনা রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন এজেন্সিগুলির মাধ্যমে প্রায়শই বিদেশী দেশের আধিকারিক ও রাজনীতিকদের নানানভাবে প্রলোভিত করে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চালালেও সরাসরি নগদ ঘুষের ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই কার্যকলাপে যে প্রশ্নটি সব থেকে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে তা হলো তাঁকে কি কেউ ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল বুঝিয়েছিল? না কি তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর বৈমানিকদের অপদস্থ করতে এই কর্ম করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে এক ভারতীয় কূটনীতিক বিস্ময় ব্যক্ত করে বলেছেন, তিনি কর্মজীবনে কখনওই চীনের কোনও নেতাকে এরকম খোলাখুলি নগদ টাকায় বখশিস দেওয়ার স্পর্ধা দেখানোর কথা শোনেননি। তবে অনেকেই জানেন চীনা আধিকারিকরা বা নেতারা সরকারি সফরের সময় নানান উপহার বা 'hongpao' নামে টাকা ভরা লাল খাম উপহার হিসেবে দিয়ে থাকেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এই ধরনের উপহার সামগ্রী সবসময়ই এক দেশের সরকারি প্রতিনিধির তাঁর সমমর্যাদার অন্যদেশীয় প্রতিনিধিকে দেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু চীনা সরকারি প্রতিনিধির নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিমানবাহিনীর বৈমানিককে সরাসরি নগদ দেওয়ার ঘটনা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট বৈমানিকরা এই অযাচিত ঘটনার কথা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন।

মন্দিরের জমি দখল হালিশহরে

সংবাদদাতা।। উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরের নয়াবাজারে মা কালী মন্দিরের লাগোয়া জমি গত ২৯ আগস্ট একশ্রেণীর মুসলমান দখল করে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলে ও চাঁদ-তারা মার্কা পতাকা পুঁতে দেয়। এই মন্দিরে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মন্দিরের আশেপাশে কয়েকঘর হিন্দু পরিবারও আছে। তারা জমি দখলকারীদের বাধা দিতে গেলে গলা কেটে ফেলে দেওয়া হবে বলে ভয়

দেখানো হয়। দখলকারীদের বক্তব্য, হাজিনগর জুট মিল কর্তৃপক্ষ ওইখানে কারখানার গেট তৈরি করবে। এজন্যেই নাকি জমি দখল। কিন্তু মালিক কর্তৃপক্ষের তরফে তা অস্বীকার করা হয়। বিষয়টা নিয়ে থানায় অভিযোগ করলেও এখনও কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বারবার তারিখ বদলে দিয়ে থানা বিষয়টার ফয়সালা করতে চাইছে না, এড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বনধ্-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের দাবিতে নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এন ই এস ও)-র ডাকে সমগ্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলে ১২ ঘণ্টার বনধ হয়ে গেল। মণিপুর, মিজোরাম ও অরুণাচলে এই বনধ ছিল সর্বাত্মক। ত্রিপুরার জনজাতি এলাকাতেও এই বনধের প্রভাব পড়ে। বাজার, দোকানপাট, গাড়ি চলাচল বন্ধ তো ছিলই, এমনকি আন্তঃরাজ্য চলাচলকারী বাসগুলিও যাতায়াত করতে পারেনি। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের দাবিতে ওইদিন গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের মানুষই যোগ দেয়। বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকে তীব্রভাষায় নিন্দা করা হয়।

গুয়াহাটির লাটাসিন খেলার ময়দানে ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলই, সেইসঙ্গে বহু বয়স্ক নাগরিক ও মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। স্লোগান উঠছিল— অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত কর, বহিষ্কার কর।

এন ই এস ও-র ডাকা বনধকে অন্যান্য ২৬টি জনজাতি সংগঠন এবং সাতটি রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনও সমর্থন জানায়। এই জনসমাবেশকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে এন ই এস ও-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য অসম আন্দোলনের (১৯৭৯-১৯৮৫) পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রয়াত রাজীব গান্ধী ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী যিনি কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের চেয়ারপার্সনও, এই চুক্তি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এন ই এস ও-র দাবী

- অবিলম্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বহিষ্কার করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি কার্যকর করতে হবে।
- ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এন আর সি)-কে আপ-টু-ডেট করতে হবে এবং তা লোকসভা নির্বাচনের আগেই শেষ করতে হবে।
- লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত 'সীল' বা বন্ধ করে দিতে হবে।
- ১৯৭১-এর পর অসমের কোকরাঝাড়, চিরাংগ, ধুবড়ি ও বঙ্গাইগাঁও-এ যারা এসেছে তাদের জমিজমার মালিকানা নিয়ে আইনত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। (No Land Settlement)।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিতে হবে।

এটাই এখন সঠিক সময় যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বহিষ্কার করতে সব রাজ্যগুলি সংগঠিতভাবে সরকারকে বাধ্য করবে।

কয়লাব্লকের পর থোরিয়াম দুর্নীতির অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ কয়লা দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গেই আরও বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। প্রকাশ্যে এল থোরিয়াম দুর্নীতি। এই দুর্নীতি সামনে এলে টাকার অঙ্কে ম্লান হয়ে যাবে ইউ পি এ সরকারের যাবতীয় দুর্নীতি। এক দশকে প্রায় ৪৮ লক্ষ কোটি টাকার থোরিয়াম উধাও হয়েছে। ভারতের সমুদ্র সৈকতে রয়েছে মোনাজাইট, ইলমিনাইট, রুটাইল, গারনেট, জিরকন, সিলিমানইটের মতো মূল্যবান তেজস্ক্রিয়পদার্থসমৃদ্ধ বালি। তবে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বালি হলো মোনাজাইট সমৃদ্ধ বালি। তা থেকেই নিষ্কাশন করা হয় থোরিয়াম। খবরে প্রকাশ ২১ লক্ষ টন মোনাজাইট বালি অর্থাৎ ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩০০ টন থোরিয়ামের কোনও হদিশ নেই। ভারতের নিউক্লিয় প্রযুক্তি ও তেজস্ক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বেশিরভাগই থোরিয়াম প্রযুক্তির। এই পরিমাণ থোরিয়াম না থাকার অর্থ অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নিউক্লিয় গবেষণা সমস্যায় পড়বে। ওড়িশার স্যান্ড কমপ্লেক্স এবং তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী সমুদ্র এলাকাকে ভারতের সবচেয়ে বড় মোনাজাইট বালির উৎস বলে ধরা হয়। এই বালি থেকে থোরিয়াম নিষ্কাশন করার পর কোনও পাথুরে এলাকায় তা ধরে রাখতে হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আই আর ই এল তাদের ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও কেরলে নিজস্ব গবেষণাগারে মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। তবে নিষ্কাশিত থোরিয়াম কেবল দেশের জন্যই ব্যবহৃত হবে। বিদেশে পাঠানোর কোনও অনুমতি নেই। গত ৩০ নভেম্বর ২০১১ সালে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি নারায়ণ স্বামী এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, মোনাজাইট রপ্তানির জন্য কোনও সংস্থাকেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবুও বিপুল পরিমাণ বালি বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে এই খবর সামনে এসেছে। উল্লেখ্য নিউক্লিয় রপ্তানির জন্য লাইসেন্স দিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নাগপুরভিত্তিক মুখ্য কন্ট্রোলার অফ মাইন। ২০০৮ সালে সিপি অ্যাম্ব্রজ এই পদ থেকে অবসরের পর এই পদে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। 'কন্ট্রোলার অফ মাইন' রঞ্জন সহায় একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনিই নাকি বেআইনিভাবে থোরিয়াম পাচারে মদত দেন বলে অভিযোগ।

কয়লা দুর্নীতির পর প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা এই দপ্তরের বিরুদ্ধে আরও এক গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। তাই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহতি পাওয়া ক্রমশ অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

আমজনতার অভিযোগের প্রতিকার করতে ‘শুল্কমুক্ত হেল্পলাইন’ খুলছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়াতে এবার শুল্কমুক্ত হেল্পলাইন খোলার পরিকল্পনা নিল বিজেপি। দলের কেন্দ্রীয় স্তরে এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি সমস্ত রাজ্যে বাস্তবায়িত করার তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

লক্ষ্মীকান্ত বাজপাই

পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনও রাজ্যে কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট নাম্বারটি ঘোরালেই তাঁর অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে পারবেন। অভিযোগটি নেওয়ার জন্য লক্ষ্ণৌই থেকে নিয়ন্ত্রিত বিজেপি-র মুখ্য কল সেন্টারটিতে পদস্থ কল সেন্টার আধিকারিক থাকবেন। তিনি অভিযোগটি পূর্ব-নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দিলেই সেখানকার দলীয় নেতৃত্ব অভিযোগটির যথাযোগ্য সুরাহা করবার চেষ্টা করবেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ ওই একই টোল ফ্রি নম্বরটি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়েও কার্যকর থাকবে, যাতে দলীয় কর্মীরা সরাসরি রাজ্যের মুখ্য কার্যালয়গুলির নেওয়া সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সব সময় ওয়াকিবহাল থাকে।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বাজপাই সাংগঠনিক কার্যকর্তাদের এক বৈঠক শেষে বলেন, এই কল সেন্টারটি আগামী মাসের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। এই নম্বরের মাধ্যমেই সমস্ত রাজ্যগুলির আমজনতার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন তিনি। উদাহরণ দিয়ে শ্রী বাজপাই বলেন, ধরা যাক কোনও নাগরিক কোনও মুশকিলে পড়েছে, পুলিশ বা সরকারের তরফ থেকে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। কিংবা কোনও গুণ্ডা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেই অভিযোগকারী বা অভিযোগকারিণী ওই টোল মুক্ত নম্বরের মাধ্যমে সরাসরি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় স্তরে অভিযোগটি পাওয়ার পর দলের মুখ্য কার্যালয় বিশদ বিবরণ ও মতামত সহ অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পদাধিকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তৎক্ষণাৎ বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের গোচরে আনবেন। এতে ফল না হলে দলীয় কার্যকর্তারা সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগটি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হবেন।

খবরে আরও প্রকাশ কোনও অঞ্চলের কর্মীদের তাঁদের অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত অভিযোগ থাকলে তার প্রতিবিধানে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আব্যশিকভাবে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ে জানাতে হবে। এ ভাবে সমস্ত অভিযোগ নিয়ে একটি সম্পূর্ণ তালিকা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত তথ্যের একটি সজীব ভাণ্ডার তৈরি হয়ে যাবে। এই তালিকাটি প্রধান দপ্তরে প্রতিদিন নবীকরণ বা আপডেটেড করা হবে। প্রত্যেক রাজ্য সভাপতি গৃহীত হওয়া অভিযোগগুলির নিরন্তর তদারকি করবেন। এছাড়াও নাগরিকেরা মনে করলে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেও বিজেপি-র সাহায্য নিতে পারে। আবার তার নিজের অঞ্চলে কোনও বড় ধরনের বিপজ্জনক ঘটনা ঘটলে বা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এলেও তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য আবেদন করা যাবে।

জেলায় জেলায় কর্মীবৃন্দ যাতে এই অভিনব দলীয় উদ্যোগের সঙ্গে যথাযথ ভাবে সড়গড় হয়ে গিয়ে এটিকে মানুষের প্রয়োজনে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তাই লোকসভা নির্বাচনের আনুমানিক এক বছরের বেশি বাকি থাকতেই এটিকে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

রাজ্যের মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নজরুল

গূঢ়পুরুষের

কলম

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ডাইরেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ নজরুল ইসলামের লেখা একটি বই 'মুসলমানদের করণীয়'-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিতর্কের শুরু হয় যখন কলকাতা পুলিশের একটি বড়সড় দল বইটির প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ'-এর দোকানে এবং গুদামে হানা দেয়। আই পি এস নজরুলের বইটি রাজ্য সরকার বা আদালত কেউই এখনও 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করেনি। তবু কলকাতা পুলিশ আগ বাড়িয়ে প্রকাশন সংস্থার দোকান ও গুদামে হানা দিল কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে বইটির পাতা ওল্টাতে হবে। বইটিতে যে বক্তব্য নজরুল সাহেব রেখেছেন, তার দু'টি স্পষ্ট বিভাজন আছে। প্রথম অংশের বক্তব্যে লেখক তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর চেলাদের মুসলিমদের মসিহা সাজার চেষ্টাকে বিদ্রূপ করেছেন। বক্তব্যের (পড়ুন উপদেশের) দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী মুসলিমদের চিরশত্রু উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়। এরাই ১৯৪৭ সাল থেকে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে মুসলিমদের উচিত তপশীলভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের যুক্ত করে একটি 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' তৈরি করা। পুলিশের এই আমলার মতে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে মুসলিমদের করণীয় এখন মনুবাদী হিন্দুদের রাজনৈতিক দলগুলি পরিত্যাগ করে ইসলাম বিশ্বাসী জোট গঠন করা। পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মুসলমানরা কোনওদিনই ন্যায় বিচার পাবে না।

লেখক তাঁর বক্তব্যের প্রথমাংশে বলেছেন, তৃণমূল নেত্রী মুসলমানি সাজে ইফতার পার্টিতে খেজুর খাচ্ছেন, ঈদ উপলক্ষে সকলের সঙ্গে একত্রে নমাজ-আদা করছেন, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিনদের ভাতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এ সবই মুসলমানদের বোকা বানাতে করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পুরুষানুক্রমে মুসলিম বিদ্বেষী। হাজার বছর ধরে এই সম্প্রদায়ের মানুষের রক্তে ইসলামের প্রতি চরম ঘৃণার স্রোত বইছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখতে বামুন বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখন কথায় কথায় ইনশা আল্লা-খোদা হাফিজ বলছে। এরা ইসলামের বাণীর মর্ম বোঝে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। লেখক বলেছেন, মুসলিমদের শিক্ষার্থীদের জন্য মাদ্রাসা চাই না। দেশের মূল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা পরিকল্পনা করেই মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, মূল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজ্যের বাংলাভাষী মুসলমানরা প্রশাসনের উচ্চপদে বসতে না পারে। প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি বা পেশায় হিন্দুরাই এগিয়ে থাকে। লেখকের মতে, এই কারণেই স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম স্বরাষ্ট্র সচিব অথবা পুলিশ কমিশনার হয়নি। লেখকের বিশ্বাস, মুসলমানের স্বার্থরক্ষা একমাত্র মুসলমানই করতে পারে। এরজন্য রাজ্যের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে।

লেখকের প্রথমাংশের বক্তব্যের বিরোধিতা করা অথবা না করা নির্ভর করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের উপর। আদালতের উপর। কোনও বই 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা না করেও স্রেফ পুলিশকে ব্যবহার করে বই বাজেয়াপ্ত করা যায় কীনা তার বিচার আদালতে হবে। ইতিমধ্যেই প্রকাশনা সংস্থা কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে। মানবাধিকার কমিশনেও আবেদন করা হয়েছে। এইসব প্রশ্নের আইনি জবাব আদালত দেবে। বইটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যটি আমার মতে অভিসন্ধিমূলক। ধর্মের আড়ালে হিন্দু-বিদ্বেষী ষড়যন্ত্র। এর সর্বজনীন প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। বলা হয়েছে, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মহাত্মা গান্ধী সকলেই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেছেন। তাঁরা ঈশ্বর ও আল্লাকে সম আসনে বসিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। এটি ইসলাম ধর্মবিরোধী। ইসলামে আল্লাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তাই আল্লার সঙ্গে ঈশ্বরকেও শ্রেষ্ঠ বলতে পারে না কোনও মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কট্টর মুসলিম বিদ্বেষ থেকেই 'বন্দেমাতরম' লিখেছিলেন। এই মুসলিম-বিদ্বেষী গান মুসলমানদের গাওয়া উচিত নয়। ইসলামে একমাত্র আল্লাই উপাস্য। জননী-জন্মভূমি নয়। আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে বন্দনা করা যায় না। মুসলমানের মসিহা একজন সাচ্চা মুসলমানই হতে পারে। ভট্টাচার্য-বন্দ্যোপাধ্যায়রা নয়। লেখক দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় মনোনীত সাংসদদের একজনও বাঙালি মুসলিম নেই। প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চপদে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। এই পরিস্থিতির বদল চাইলে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে জোট করতে হবে। তবেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম রাজ কায়েম করা সম্ভব। ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দুদের চাপিয়ে দেওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামাই হবে রাজ্যের 'মুসলমানদের একমাত্র করণীয়' কর্তব্য।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অনুমান, অসমের জাতি দাঙ্গায় অনুপ্রাণিত হয়ে পুলিশের এই উচ্চপদস্থ আমলা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন রাজ্যের মুসলমান যুবকদের। এটি একটি সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। দাঙ্গার প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা। নজরুল সাহেব একদা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে পি এইচ ডি উপাধি পেয়েছেন। 'দাঙ্গা' ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর প্রিয় বিষয়। সেই প্রিয় তাত্ত্বিক বিষয়টিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখতে চাইছেন তিনি। একজন সরকারি আমলাকে এমন বই রচনা করার আগে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন নিতে হয়। সম্ভবত সেইরকম অনুমোদন তিনি নেননি। কারণ, গত সপ্তাহে মধ্য কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক সেমিনারে নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'মুসলমানদের করণীয়' বইটি লেখার জন্য তাঁকে সরকারি পদ থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি বৃহত্তর মুসলিম সংহতির জন্য রাজ্যজুড়ে প্রচার অভিযানে নামবেন। ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন নজরুলের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। □

রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে?

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

সিপিএম-পরিচালিত যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনের আগে সংগঠনের বিদায়ী নেতা তাপস সিন্‌হা-কে নিয়ে জোর দ্বন্দ্ব চলছে। সিপিএম-এর পলিটব্যুরো-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই সভাপতির পরিবর্তন চান। পলিটব্যুরোর নতুন সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র তাপস সিন্‌হার বিরুদ্ধে। তাপসবাবু দলের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক সরকারের মনোনীত।

সংগঠনে নেতৃত্ব নিয়ে যতই তরজা হোক, সংগঠনের কাজকর্মের তেমন কোনও লক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যে সিপিএম-এর বিপর্যয় নিয়ে নেতৃত্ব থেকে নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখা যাচ্ছে না। যে-পার্টি নিজেদের দোষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে সে পার্টির উত্থান অসম্ভব।

সিপিএম সারা রাজ্যে বস্তি সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি (?) শ্রমিকদের মধ্য থেকে অপসারিত হচ্ছে। কলকাতার পোর্ট-ডক-খিদিরপুর-বেহালা অঞ্চলগুলিতে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উত্তর ২৪ পরগণাতে জেসপ-এ পার্টি বিপর্যস্ত। যাই হোক, বস্তিসংগঠন গড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনে ভোট বাড়ানোর প্রচেষ্টা। কারণ এ-দেশের কমিউনিস্ট নামধারীরা ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মশগুল। ভবিষ্যতে এই স্বপ্নকে সত্য করার জন্য যে কোনও দলের সঙ্গে কমিউনিস্টরা গাঁটছড়া বাঁধতে ইচ্ছুক হবেই। এখন ভোটকে লক্ষ্য রেখেই পার্টির কাজ করা। তাই ভোটে বিপর্যস্ত হলে পার্টির কোমর ভেঙ্গে যায়, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে। সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে পার্টিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। কেননা পার্টিতে বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু এখানে যে বিষয়টা দলের রাজ্য নেতারা বুঝতে চাইছেন না, তা' হলো পার্টির নিচের তলার কর্মীরা মনে করেন যে, বুদ্ধবাবুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা, কাজকর্ম, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে দমন-পীড়ন নীতিই পার্টির বিপর্যয়ের মূল কারণ।

এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফর করে এলেন। জেলা-সফরে তিনি কল্পতরু। বিশাল কর্মকাণ্ডের ঘোষণা করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়কে খুশি করতে মুখ্যমন্ত্রী মুসলিম মহিলাদের মতো পোশাক পরে বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ভাত দেবার ভাতার নয়, হিন্দু-মুসলিম ভাগ করতে চায়!' মুখ্যমন্ত্রী নতুন ১০টি হাসপাতাল খোলার কথা ঘোষণা করেছেন। যার জন্য ব্যয় হবে ৪০০ কোটি টাকা। ওই টাকার সংস্থান কি করে হবে? এদিকে কংগ্রেস সাংসদ দীপা দাসমুন্সিকে কোণঠাসা করে দিল্লীর এ আই আই এম এস-এর ধাঁচে নতুন হাসপাতাল রায়গঞ্জে না হওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মুসলিম-তোষণের ফলে সম্প্রতি একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ডঃ নজরুল ইসলাম-পুলিশকর্তাকে কোণঠাসা করেছিলেন। নজরুল ইসলাম দিল্লীতে চলে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হয়ে নজরুল ইসলামকে রেলের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান করে দেন। নজরুলকে বলা হয় মমতা মুখ্যমন্ত্রী হলেই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসে পুলিশের অন্যতম কর্তা করে দেওয়া হবে। নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গে এলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। কারণটা কি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা 'সমরবাবু'র সঙ্গে ডঃ নজরুল ইসলাম-এর সম্পর্ক খারাপ? নজরুল ইসলামের বই-তে দশ হাজার মাদ্রাসাকে স্বীকৃত দেওয়ার সমালোচনা করে লেখা হয়েছে— মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার দরকার আছে। এছাড়া এই বইতে রোজা না রেখে ইফতার-এ যোগদান করা, মুসলিম মেয়েদের মতো মাথায় হিজাব পরে মুসলিম তোষণের সমালোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের প্রকাশক মানবাধিকার কমিশন এবং হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বিগত ২১ জুলাই-এর সমাবেশে মমতা ঘোষণা করেছেন '৫ বছরে ৫০ লক্ষ লোকের চাকরির ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে ৭০ হাজার লোকের চাকরি দেওয়া হয়েছে। ২০-২৫ হাজার লোক পুলিশে চাকরী পেয়েছে।' রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৭৮ লক্ষ। এদিকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের কাউন্সেলিং দরকার।' এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা উঠেছে। কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যমের সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতাকে কার্যতঃ তাচ্ছিল্য করলেন মমতা।' একটি ইংরাজি দৈনিকের প্রাক্তন সম্পাদক নিহাল সিং বলেছেন, 'একটা বিপজ্জনক স্বর উত্তরোত্তর তাঁর গলায় প্রকট হচ্ছে। এটা জরুরি অবস্থার কথা স্মরণ করাচ্ছে।'

কুলদীপ নায়ার বলেছেন, 'মমতার নিজেরই কাউন্সেলিং দরকার।' রুদ্রপ্রসাদ সেন-কৌশিক সেন-তরুণ সান্যাল প্রমুখরাও সমালোচনা করেছেন।

ইনফোসিসকে জমি দেওয়া নিয়ে জটিলতা হচ্ছে। এ সম্পর্কে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেছেন— যৌথ উদ্যোগ হলে সমস্যা মিটে যাবে। নয়াচর দ্বীপটিকে অনাবাসী ভারতীয়-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জেলেরা বলেছেন এতে তাঁদের সর্বনাশ হবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন বুদ্ধবাবুরা নয়াচরে কেমিক্যাল হ্যাব করতে চাইলে মমতা বাধা দিয়েছিলেন। রাজ্যের বিরোধীদল হিসেবে যে প্রসূন মুখার্জিকে সমালোচনা করেছিলেন, আজ সেই প্রসূনই বন্ধু হয়েছেন! □

ওড়াব কিন্তু কাটব না

বন্ধু ঘুড়ি
মেঘেদের দেশ
নীল আকাশ

ঠিকানাটা কি পছন্দ হয়েছে ভাই! তোমাকে দোকানে ঝুলতে দেখেছি, বিশ্বকর্মা ঠাকুরের হাতে দেখেছি তবু তুমি আকাশের। মেঘেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলাই তোমার কাজ। উড়তে উড়তে ছোট্ট হয়ে যাও, অনেক অনেক দূরে চলে যাও। তবু তুমি হাতের কাছেই। লাটাইয়ের সুতো গুটিয়ে গুটিয়ে তোমায় আবার কাছে আনা যায়। আদর করা যায় শুশ্রুষা করা যায়। আবার ধোলাই দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায় দূর সে আকাশে। সেই অচিন দেশে যেখানে কখনও যাইনি, কখনও যাবও না, কখনও যেতে পারবও না।

ওখান থেকে কেমন লাগে এই পৃথিবীটাকে একদিন বলবে? গাছ- গাছালির ফাঁক দিয়ে, ৩২ তলা ৩৩ তলাদের ডাইনে বাঁয়ে রেখে অত এত ওপর থেকে আমার পাড়া, আমার শহর, আমার দেশকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। লাটাইয়ের সুতোয় তুমি আমার হাতে। জানি স্বাধীনতা নেই। তবু মনের ডানা মেলে উড়ে যেতে তো পার! সেটাই বা কজনের ভাগ্যে হয় বল?

ঘুড়ি তুমি লাল, তুমি হলুদ, তুমি সবুজ, তুমি মেরুন, তুমি কাস্তে হাতুড়ি, তুমি ঘাসফুল। তুমি পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, বগ্গা, মুখপোড়া। পাখনা থাকুক আর না থাকুক তুমি ময়ুরপঙ্খী। আমি জানি এত রূপ, রঙ নিয়ে তোমার উড়তে ভাল লাগে। শুধু উড়ে যাওয়া। মন ভরে নীচের পৃথিবীটাকে দেখা। কিন্তু ঘুড়ি, আমরা তোমাকেই লড়াইয়ে নামাই। কখনও টেনে, কখনও ছেড়ে, কাঁচের মাঞ্জার ধারালো অস্ত্রে সাজিয়ে তোমায় আকাশ লড়াইয়ে পাঠাই। আমাদের সুতোর টানে তুমি স্বজাতির বিরুদ্ধে কখনও ওপর থেকে কখনও আন্ডার দ্য বেল্ট আচমকা হানা দাও। শুরু হয় লড়াই। লেগে যায় প্যাঁচ। ক্রীড়ানকের মতো তোমার সেই অনিচ্ছার লড়াইয়ে মেতে ওঠো। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ কর। আমরা উল্লাশে চিৎকার করে উঠি, ভোওওওককাটা...।

তারপর যে কেটে গেল সে কোথায় গেল? কে জানে। কোন অজানা দেশে চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে অজানা প্রান্তরে! সেখানেও আবার তার অধিকার নিয়ে লড়াই। কেউ হয়তো লুঠে নিল তাকে। কেমন মানুষ সেই লুঠেরা? সেকি তোমার আপনজন হবে? তুমি জান সেও একদিন তোমায় ঠেলে পাঠাবে আকাশের রণক্ষেত্রে। আরও এক ভাইয়ের প্রাণ নিতে। আবার যাকে কেউ লুঠে নিতে পারল না সে হয়তো কোনও গাছের ডালে ফেসে থেকে ঝুলতে থাকবে। রোদে জলে একটু একটু করে বিবর্ণ হতে হতে একদিন কাঠিটুকু সার হয়ে থেকে যাবে। কেউ আর ফিরেও তাকাবে না।

ঘুড়ি তোমাকে যখন এই চিঠি লিখছি তখন একেবারেই মন ভাল নেই। শুধু আমার না এই রাজ্যের এই দেশের কারও মনই ভাল নেই। কী করে থাকবে বল? চারিদিকে শুধু ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা চলছে। খেলাধূলার ময়দান থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবেতেই খালি প্যাঁচ খেলা। কেউ ধোলাই দিচ্ছে দুর্বলকে, কেউ মাঞ্জা পাকাচ্ছে লড়াইয়ে নামবে বলে। কেউ লুঠে নিচ্ছে নারীর সম্মান। কেউ আবার জীবনের প্যাঁচে হেরে গিয়ে অনেক ওপরে তোমাদের দেশ থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে মাটিতে। কেউ কেউ বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকছে গলার নলি কাটা অবস্থায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। কে জিতছে, কে হারছে কেউ জানে না। কিন্তু নৃশংস উল্লাসে সক্কলে চিৎকার করে বলছে, ভোওওওককাটা...।

সোজা সরল পথের চাবিকাঠিটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সবকিছুতেই মারামারি। 'কন্‌টিকি' চলচ্চিত্রে এবং রূপদর্শীর লেখা 'স্বর্গ এখানে' উপন্যাসে দেখেছি পলিনেশিয়ায় লেগুনবেষ্টিত প্রবাল-প্রাচীরে ঘেরা দক্ষিণ সাগরের ছোট্ট দ্বীপ রারোইয়ার কথা। তথাকথিত সভ্যতা সেখানে তখনও অধরা। সেই দিনেও সে দ্বীপের মানুষের ফুটবল খেলতেন শুধু ড্র করার জন্য। হারজিত নেই। এর খেলোয়াড়কে জোর করে ওর করে নেওয়া নেই। কোনও দল গোল খেয়ে শোধ দিতে না পারলে অপরপক্ষ নিজেদের গোলেই বল ঢুকিয়ে সমতা এনে দেয়। খেলা মানে শুধু খেলা। লড়াই নেই। কিন্তু সভ্য দেশ সেসব মানে না। সেখানে মুখ ফাটিয়ে, কান কামড়ে বক্সিং, কুস্তি জিততে হয়। ছোটদের যে মারামারিকে আমরা নিন্দে করি সভ্যতা বলে সেটাই আসল প্রতিযোগিতা।

সামনেই আশ্বিন মাস। উৎসবের মাস। বিশ্বকর্মা পুজো থেকে শুরু হয়ে আকাশ জুড়ে লাগবে ঘুড়ির পরব। ছাদে ছাদে লাটাই হাতে ছেলেরা উঠবে যুদ্ধ করতে। আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক দেখলে মনে হবে 'কত সেনা চলেছে সমরে...।' আমি ওই দলে নেই। আমি তখন জানলার পাশে বসে আকশের পানে চেয়ে দেখতে পাব কোনও লড়াই নেই। নানা রঙের ঘুড়িতে ছেয়ে যাবে আকাশ। রামধনু রঙে সেজে উঠবে নীল আকাশের ক্যানভাস। অবাক চোখে দেখবে মেঘেরা। গোটা বিকেল জুড়ে সেই আকাশ সাঁতারের শেষে নেমে আসবে সবাই। সিজ ফায়ার ঘোষণা হবে আকাশ দেশে। আবার পরদিন নির্দিষ্ট সময় সব ঘুড়ি মেলে দেবে ডানা। প্রতিদিন বিকেলে হাজার ঘুড়ির প্রদীপ জ্বলে উঠবে আকাশ জুড়ে। এক ফোঁটাও রক্ত ঝরবে না।

— **সুন্দর মৌলিক**

দুর্বৃত্তের দুঃশাসনে দুর্বিপাকে দেবভূমি

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

ত্যাগের আসনে ভোগ আজ জায়গা করে নিয়েছে। যোগী নির্বাসনে নিভৃতে ক্রন্দন করছেন। সমাজ সংসারের দখল নিয়েছে ভোগী। ব্রাহ্মণের আসনে বণিক এসে বসেছে। বেদকে বর্জন করে ধনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বৈশ্যকুল। ধনিকশ্রেণী সমাজে শ্রদ্ধা দাবী করছে যাঁর জীবনদর্শনে অসদাচার এবং তিনি সে বিকৃত আর্থিক মনস্কামে পরিপূর্ণ। অধিক অর্থচিন্তা আমাদের সুখ দিতে পারে কি? কারণ শান্তি ও সত্য দুই-ই দূরে চলে গেলে প্রকৃত সুখী হয়ে ওঠা যায় না। এখানে ব্রাহ্মণ জাতি পরিচয়ে ব্যবহৃত নয়, সত্য পথের পথিক সদাচারী ব্যক্তির পরিচয়। শাস্ত্রও কর্ম গুণে বর্ণের কথা বলেছে, জন্ম সেখানে মুখ্য নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই নিভৃতে বিরাজমান 'ব্রাহ্মণ' সত্তাকে জাগরিত করতে হবে ঋক্‌মন্ত্রে, ধ্যানে, সাধনায়, নিষ্কাম কর্মের দীক্ষায়।

আজকাল কর্মযোগের কথা সকলে বলে। অপব্যাখ্যা করে অর্ধসত্য বলে। কর্মযোগ মানে দুর্নীতিপূর্ণ কর্ম দ্বারা কালো টাকা আয় করা নয়। এমন কি নিজে রোজগার করে ভালো খেয়ে পরে ভোগে বিলাসে কাটিয়ে চলে যাওয়াও নয়। কর্মযোগের মূলে আছে নিষ্কাম কর্ম। সাধনার জীবনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের সাধুরা তার উজ্জ্বল প্রকাশ। আমরা কি আদৌ কর্মযোগী? নাকি নিজেদের স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ততা ঢাকতে কর্মযোগকে ব্যবহার করছি ও নিজ দীনতা তাতে আরও প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃত কর্মযোগী কিভাবে হওয়া যায় তা স্বামীজী দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেবা দর্শনের মূল ভাবটি জানতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন, ''প্রত্যেক নরনারীকে— সকলকেই ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখতে থাক। তোমরা কাউকে সাহায্য করতে পার না, কেবল সেবা করতে পার, প্রভুর সন্তানদের, যদি সম্ভব হয়, স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁর কোনও সন্তানের সেবা করতে পার, তবে তোমরা ধন্য। নিজেদের খুব বড় কিছু ভেব না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করার অধিকার পেয়েছ, অন্যে তা পায়নি। উপাসনাবোধে এটুকু কর।''

> "সাংবিধানিক নিরপেক্ষ পদগুলিতে যেমন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল সেখানে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই এগিয়ে দেবার কথা স্বীকৃত হতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এই পদে বসানোর ফলে কিরূপ ব্যবহার হয় রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা থেকেই তা প্রমাণিত। শাসন ক্ষমতায় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরও থাকা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ সাংবিধানিক পদে সেটাই রীতি হওয়া উচিত এবং কালক্রমে তার জন্য সাংবিধানিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।"

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারি চাকরী বা সরকারী পদে বসার যোগ্যতা শুধু শিক্ষাগত হতে পারে না। ছলে বলে কৌশলে লিখে দেখে কোনওক্রমে নম্বর পাওয়া কিছুই প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করে না। আজ দেখা যাচ্ছে ৫০ শতাংশের নীচে ভোট পেয়ে জিতে আসার পর তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্য নিয়ন্তা। 'First past the post system'-এর বদলে 'proportional representation' -কে মেনে চলতে হবে। মাত্র ৩০ শতাংশ বা তার চেয়েও কম ভোট পেয়ে সমস্ত সরকারি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে দুর্বৃত্তকে রক্ষা করার দুঃশাসন আজ দেশের জন্য দুঃসময় ডেকে এনেছে।

পশ্চিমের ধারণা বুকে নিয়ে যখন বৈদিক শান্তির কথা শুনি তখন মনে হয় এ তো জীবন সায়াহ্নের চিন্তা। কিন্তু কর্ম যখন তার বিপুল ধারায় জীবনকে আপ্লুত করে রাখে ও সুখের সন্ধানে মানুষ আত্মহারা হয়ে থাকে তখনও সুখের প্রাপ্তি তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারে না। ভয় তাড়া করে বেরোয় যে অর্জিত সুখ কখন আবার উধাও হয়ে যাবে। নিজের মধ্যে সেই অনিশ্চয়তাকে ডাকতে সে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুখের সন্ধানে সত্য অসত্য ভালো মন্দ বিচার ভুলে অচৈতন্যের মতো সে সাধন সংগ্রহে নেমে পরে।

পরের অধিকার খর্ব করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে সমস্ত সমাজকে জতুগৃহে পরিণত করার ফলে সে নিজের

উত্তর সম্পাদকীয়

অন্তরের অসুস্থতাকে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষমতাবান মানুষগুলির নীতিহীনতা, দুর্নীতিপরায়ণতা সমস্ত সমাজকেই সেই মোহে আবদ্ধ করে বিশ্বকেই এক বিষম ক্রূর ও কপটতার কংস কারাগারে পরিণত করেছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ কৃষ্ণ দর্শনের পথ পরিহার করে কংসের ভাবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রবৃত্তি মার্গের ভাব পা বাড়াল মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে। নিবৃত্তি মার্গের সাধনা তার অধরাই থেকে গেল, আর নিবৃত্তি মার্গের ভাব না থাকলে প্রকৃত সেবক হওয়া যায় না। ত্যাগের সঙ্গে সেবা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাঁরা সামান্যতম ত্যাগেই অনভ্যস্থ তাঁরা নামলেন দেশসেবায়। তারপর যা হবার তাই হয়েছে, যম ও যবনের হাতে পড়ে যন্ত্রণায় দিন কাটছে ভক্তের। যম ও যবনের হাত থেকে প্রতিকারের মন্ত্রতত্ত্ব রয়েছে রাম নামে, রাম রাজত্বে ও রামায়ণে।

যাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনও ইচ্ছা দেখা যাবে না। উল্টে শুভ সমস্ত ইচ্ছাকে বিভিন্নভাবে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা হবে। বড় মিডিয়া গোষ্ঠী এঁদের হাতে থাকার ফলে কুটিল তর্কের জালে পথ হারিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। এঁদের সমব্যথী শক্তি যাঁরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছেন, ফলে জাগ্রত নাগরিক সমাজকে জোরের সঙ্গে নির্বাচনী সংস্কার, লোকপাল বিল ও সরকারি কর্মচারীকে দায়বদ্ধতায় বাঁধার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে মধ্যপন্থী শক্তি রাজনৈতিক নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টায় নেমেছে। নাগরিক সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ সংরক্ষণের কথা তুলে জাত-পাত ও বকলমে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ নয়, সংরক্ষণের মূল ভিত্তি হোক অর্থনৈতিকভাবে যাঁরা দুর্বল তাঁরাই।

বি পি এল নির্ণয় করা হোক আন্তর্জাতিক মান মেনে। কথায় কথায় যাঁরা পশ্চিমের দোহাই দেন তাঁরা বি পি এল নির্ণয়ের সময় তা ভুলে যান কেন? কারণ ৬৪ বছর স্বাধীনতার পর যে বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে সে লজ্জা তাঁদের শাসনের। তাই আসল চরিত্র বেআব্রু হবে জেনে ছলনার আশ্রয় নেওয়া। যাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে ধূমকেতুর মতো বড়লোক হয়েছে তাঁরা কোন পথে হয়েছে তা জানতে বাকি নেই সাধারণ মানুষের।

নির্বাচনী সংস্কারে 'proportional representation'-এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা প্রয়োজন সেখানেও আর্থিক মানদণ্ডকে সংরক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে জোড়া দরকার। ৫০ শতাংশের বেশি মানুষের সমর্থন যেমন দরকার হবে নির্বাচনের জন্য তেমনই একটি কেন্দ্রে বসবাসকারী মানুষের আর্থ- সামাজিক অবস্থার কথাও গুরুত্ব দিতে হবে। উক্ত কেন্দ্রের প্রার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে থেকে আসতে হবে। অসৎ উপায়ে ধনী হয়ে ওঠা ও বাহুবলী প্রার্থীদের বেশীর ভাগই দেখা যায় অতি দরিদ্র আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ কেন্দ্রকে পছন্দ করেন কারণ সরল মানুষকে সহজে মোহিত করে জেতার আশায়।

সাংবিধানিক নিরপেক্ষ পদগুলিতে যেমন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল সেখানে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই এগিয়ে দেবার কথা স্বীকৃত হতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এই পদে বসানোর ফলে কিরূপ ব্যবহার হয় রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা থেকেই তা প্রমাণিত। শাসন ক্ষমতায় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরও থাকা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ সাংবিধানিক পদে সেটাই রীতি হওয়া উচিত এবং কালক্রমে তার জন্য সাংবিধানিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। নাগরিক সমাজকে এ বিষয়েও ভেবে দেখা জরুরি।

দেশসেবার মতো সবচেয়ে কঠিন কাজ যেখানে একজন ব্যক্তিকে 'Universal Oneness'-এর বৈদান্তিক ভাবকে আত্মস্থ না করে প্রকৃত সেবক হওয়াই মুশকিল, যেখানে সাধনার লেশমাত্র নেই এমন নেতা- নেত্রীকে দেশসেবার ভার দিয়ে দুর্বৃত্তায়ণকে আটকানো অসম্ভব। রাজনীতিকে যাঁরা পেশা হিসাবে নিয়েছেন তাঁরা সেবা করবেন কিভাবে? ৫৪ বছর ধরে একটি মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল দেশ শাসনের পরেও ভারত চীনের মতো বিশ্বে বৃহৎ শক্তি হতে পারল না কেন? ভারত চীনের আগে স্বাধীনতা পেয়ে চীনের থেকে পিছিয়ে পড়ল কেন? চীনে ৬২ বছর একদলীয় শাসন আর ভারতে ৫৪ বছর একটি দলই কেন্দ্রীয় শাসনে থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন চীনের থেকে এগিয়ে যেতে পারলাম না তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এ চীনের কমিউনিস্ট শাসনের সাফল্য নয় ভারতের মধ্যপন্থী শাসনের ব্যর্থতা। ভারতের শাসক ভারতের সনাতন রীতি মেনে রাজ সন্ন্যাসীর দর্শনে দীক্ষা নিয়ে রাজধর্ম পালন করলে আজ আমাদের এই দুর্দশা হোত না। মহাবিদ্যালয় থেকে মিডিয়া দেশবাসীকে চঞ্চলতার পথের পথিক হতে প্ররোচনা দিচ্ছে। সেখান হচ্ছে সাহেব হতে। ভারতবর্ষ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। জগতে সকল অশান্তির মূলে রয়েছে মানুষের ভিতরে বিরাজিত সন্দেহ ও কলহ প্রবণতার স্বভাব। শান্তির খোঁজে বেরোলে প্রথম অন্তরকে শান্ত করতে হবে। শান্ত না হলে সত্যের কাছেও যাওয়া যাবে না। সত্য সন্ধানের প্রয়াস না থাকলে দুর্বৃত্তায়নের মূলে আঘাত করা যাবে না।

প্রকৃতির নিয়ম মেনে অকারণে চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিলে শান্ত শিবসুন্দর দূরে থেকে যাবেন। তাই তাঁর অনুধ্যানকে কেন্দ্রে স্থাপন করতে গেলে হৃদিমন্দিরে শান্ত অঞ্চলকে স্থাপন করতে হবে এবং এ পথের সাধনায় যুক্ত হতে গেলে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের ধর্মসাধনার সত্যকে বুঝতে হবে। বৈদিক সভ্যতার পথকে না বুঝেই দেশসেবায় নামলে সে সেবার মধ্যে এক বিরাট ফাঁকি থেকে যাবে। যা স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ ৬৪ বছর আমরা দেখছি।

স্বামীজীর বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিলে চীন থাকত আমাদের থেকে এগিয়ে নয়, আমরাই সম্ভ্রম আদায় করে নিতাম জগৎসভায়।

রাজ্যের আই পি এস অফিসার নজরুল ইসলামের বই

‘মুসলমানদের করণীয়’র আড়ালে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন

বিজয় আঢ্য

সেই মুসলিম শাসনের কাল থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইংরেজদের আমলেও সেই সম্পর্কের উন্নতি তো হয়ইনি, বরং চতুরতার সঙ্গে শাসককুল সেই সম্পর্কতে আরও ফাটল সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিদ্বজনেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক আলোচনা, সভা, আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা রক্তপাত তাতে থামেনি। বৃটিশদের শাসনকালেই খিলাফৎ আন্দোলনের রেশ ধরে মালাবার অঞ্চলে হিন্দুনিধন যজ্ঞ, ’৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গা ও তার অব্যবহিত পরে নোয়াখালির দাঙ্গা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরিণতিতে মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমরা থাকতে পারবে না এই ভাবনার ভিত্তিতে দেশভাগ পর্যন্ত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে শাসক কংগ্রেস দল ও সরকার এবং কম্যুনিস্টসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই ঘটনা পরম্পরা বা ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষাই নিলেন না। বরং নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করতেও তোষণ নীতির পথ ধরলেন। এমনকী সংবাদমাধ্যমও। বেশিরভাগ ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমই মুসলিমদের কোনও খারাপ কাজের সমালোচনা করলেও তা অনেকটা রেখে-ঢেকে করে, বিশেষত তা যদি রাজনৈতিক কোনও বিষয় হয়। আবার এমন কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন যারা ভারতীয় মুসলমানদের একটা ‘স্বতন্ত্র পরিচিতি’ গড়ে তুলতেই ব্যস্ত।

এই সূত্রেই সদ্য প্রকাশিত আই পি এস নজরুল ইসলামের লেখা ‘মুসলমানদের করণীয়’ বইটির কথা বলতেই হয়। রাজ্য পুলিশের এডিজি অ্যান্ড আই জি পি (প্রশিক্ষণ) পদে কর্মরত লেখক তাঁর ১০৩ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মুসলমানদের জন্য একটি

নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন। নিজের সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি তা করতেই পারেন। নিজের সেই ইচ্ছার কথা তিনি বইয়ের ভূমিকাতে লিখেও জানিয়েছেন। তাঁর চিন্তা— এরাজ্যে মুসলমানদের অবস্থা খুব খারাপ। তারা শিক্ষায়, সরকারি চাকরিতে পিছিয়ে। রাজনৈতিক নেতারা শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ফোটায়। তাই সরকারের পরিবর্তন হলেও তাদের অবস্থার বদল হয়নি। এই বদল করার জন্য কি করা দরকার সেটাই তিনি লেখার চেষ্টা করেছেন। খুব ভালো কথা। এ নিয়ে কারও কিছু বলার থাকে না।

কিন্তু তবুও যে কিছু বলতে হচ্ছে তার কারণ হলো বদলের জন্য তিনি যেসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যেসব দাওয়াই বাতলেছেন, তাতে তার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তিনি কি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে নাড়া দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে চান? জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ধর্মমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চান? কেননা গত ২৯ জুলাই কলকাতায় মুসলিম ইন্সটিটিউটে গিয়ে ১৯৮১ ব্যাচের এই অফিসার যে ধরনের প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন, যা সংবাদমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিতও হয়েছিল, সেসব কথাই এই বইতে আরও একটু গুছিয়ে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটি প্রশ্ন উঠে আসছে। নজরুল একজন সরকারি কর্মচারী। একজন আই পি এস অফিসারের যে আচরণবিধি রয়েছে, তাতে কি এমন কাজ করা যায়? এই ধরনের লেখা কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সামিল নয়? যদি তা হয়, এমন একজন অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের কতদিন লাগবে? আই পি এসের টুপি পরে তাঁকে কতদিন আর এ ধরনের কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে?

বইটির সূচনায় ‘কয়েকটি পরিভাষা’ শীর্ষক (৭ পৃষ্ঠা) আলোচনায় তিনি লিখেছেন, শূদ্ররা ও শূদ্রদের থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আর্য ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফসল। কোন যুক্তির ভিত্তিতে তিনি এমন একটি মন্তব্য করলেন তার কোনও কৈফিয়ৎ দেননি। যদিও বহু ইতিহাসবেত্তার কাছে আর্য শব্দ জাতিবাচক নয়, সভ্যতাসূচক শব্দ বলে চিহ্নিত। প্রশ্ন হলো, এমন একটি বিষয়কে খুঁচিয়ে তুলে তিনি কী বার্তা দিতে চাইছেন? এটা ঠিক, এদেশের বেশিরভাগ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। পূর্বপুরুষদের রক্ত তাদের ধমনীতেও প্রবাহিত। কিন্তু বিষয়টির ইতিবাচক দিকটিকে উজ্জীবিত না করে নেতিবাচক দিকটি বড় করে দেখিয়েছেন নজরুল। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমরাও ধর্মান্তরিত। কিন্তু তাঁদের উপাসনা পদ্ধতি

বদলালেও তাঁরা পূর্বপুরুষদের ভুলে যাননি। কিন্তু এদেশে তা হয়নি। রাম, কৃষ্ণ প্রমুখকে তারা রাষ্ট্রপুরুষ বলে মানতে রাজি নন। রামমন্দির নির্মাণে তারা বাধা দিয়েছেন। বন্দেমাতরম বলতে নারাজ। দেশের চেয়ে তাঁদের নিজেদের ধর্মমতের প্রতি অনেক বেশি নিবেদিত। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা ছাড়া এটাকে আর কি বলা যাবে? 'বড় হয়ে', বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বেশি পড়াশোনা করতে গিয়ে লেখকের মনে হয়েছে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কোনও উচ্চ ধারণার আর প্রয়োজন নেই : (পৃ. ৯)। কেননা বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ফলে মুসলিমদের কোনও উপকার হয়নি। এক চক্ষু হরিণের মতো তিনি বিদ্যাসাগরের এই দিকটিই শুধু দেখলেন, যেহেতু বিধবা বিবাহ নিয়ে মুসলিম সমাজের কোনও আসে যায় না। যা মুসলিমদের কাছে আসে যায় না, তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন। এই ভাবনা-চিন্তা কি সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগাবে না?

তিনি লিখেছেন— বিদ্যাসাগর পুরস্কারের জন্য সুপারিশকৃত দুটি নামই ব্রাহ্মণ, তাঁদের প্রস্তাবকও ব্রাহ্মণ। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাম ওঠা দুই বাঙালিই ব্রাহ্মণ (পৃ. ৪৭-৪৮)। পশ্চিমবঙ্গের মতো জাতপাত ভেদমুক্ত একটা রাজ্যে এভাবে জাতপাতের ভেদ খুঁচিয়ে দেওয়া কতটা ক্ষমার যোগ্য?

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র ও স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। শ্রী নজরুলের দৃষ্টিতে এই বঙ্কিমচন্দ্র প্রচণ্ড মুসলমান-বিদ্বেষী। আর তা প্রমাণ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে দু'-একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ. ১১-২৫)। এই ধরনের লেখায় দেশের জনমনে ক্ষোভ তৈরির হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। একজন আই পি এস অফিসার হয়ে তিনি কী করে এমন মত প্রচার করেন?

১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মণ্ডল কমিশন চালু করার পর ভারতের জাতপাতের রাজনীতি নতুনভাবে বাঁক নিয়েছে। সেই জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবি, পাল্টা দাবি উঠেছে। এই জাতপাতের সূত্র ধরে নজরুল প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ২৫ শতাংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বিধায়কদের ২০ শতাংশ মুসলিম কেন? কেন ২৫ শতাংশই নয়? তাঁর অভিযোগ— মুসলমান প্রধান এলাকা থেকেও মুসলমানদের এম পি হতে দেওয়া হয় না। মুর্শিদাবাদের ডোমকল ব্লকে মুসলমানদের জনসংখ্যা ৮৯.৫ শতাংশ হলেও সব প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারাই হিন্দু।

তিনি মুসলমান সমাজকে নিজেদের ভাগ বুঝে নেবার জন্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছেন—

(১) রাজ্যে ২৫.২৫ শতাংশ মুসলমান হলেও রাজ্য সরকারের চাকুরীতে মাত্র ২.২ শতাংশ (পৃ. ৬০)।

(২) রাজ্যে বাঙালি মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ২৩.২৫ শতাংশ হলেও রাজ্য মন্ত্রিসভায় তাদের অংশীদারিত্ব ৯.৩ শতাংশ। (পৃ. ৬০)

(৩) মুর্শিদাবাদের মতো মুসলিমবহুল জেলায় ৩ জন এম পি-র মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান। (পৃ. ৬০)

নজরুল ইসলাম

(৪) জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমদের সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সংস্থায় চাকুরি এবং পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা এবং মন্ত্রিসভাতে মুসলিমদের সংরক্ষণের তিনি দাবী জানিয়েছেন (পৃ. ৮৭-৮৮)। এবং সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ বিধানসভাতে মুসলমানরা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই দাবী আমাদের জানা। এই স্বর আমাদের চেনা। এ তো নজরুলের গলায় জিন্নার কণ্ঠস্বর। নজরুল কি দেশটাকে আর একবার ভাঙতে চাইছেন? মুসলিমদের করণীয় কিছু নির্দেশিকার আড়ালে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন?

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব কী করে ভারতের মুসলিমদের উঠে আসতে সাহায্য করবে? ধর্মের নামে এই অন্ধতা যারা ছড়ায়, তারা সাধারণ মানুষের ঘৃণা ছাড়া অন্য আর কি আশা করে? ঘটনা হলো, বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় ভারতীয় মুসলিমদের এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য পেট্রোডলারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। 'মুসলিম সংহতি' ছাড়া যাতে আর কোনও কিছু ভাবনায় তারা আস্থা না রাখে। দেশ বা জাতীয় স্বার্থ সেখানে গৌণ। নজরুল ইসলাম এদেশের মুসলমানদের সেই পথেই হাঁটার কথা বলেছেন। এ তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। □

তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস একজোট

আলিগড় হবে আহিরণে : চাই মুসলিম ভোট

নবকুমার ভট্টাচার্য

চাষের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ হারিয়ে যেতে বসেছে আহিরণে। সবুজ মাঠ ধ্বংস করে সেখানে তৈরি হবে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাস। প্রায় হাজার আটেক মানুষের বাস এই অঞ্চলে। এরা বিশেষত হিন্দু দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের। তাই মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে আন্দোলন করা কোনও দল তাদের পাশে থাকেনি। সেদিনের প্রতিবাদী কোনও বুদ্ধিজীবীও তাদের খোঁজ রাখেনি। ফলে কৃষিজমি গিলে খাবার উপক্রম করেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তারা। পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বেই সেখানে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি হবে। তাই জোর করে সবুজ ও লাল ফেট্টিওয়ালা হার্মাদবাহিনী এবং ভৈরববাহিনীর সঙ্গে বিশাল পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স দিয়ে গ্রাম ঘিরে কৃষক-আন্দোলনের কবর খুঁড়ে জমি দখলে নিতে মরিয়া কৃষকদরদী বর্তমান সরকার। পথ এবং মতের পার্থক্য থাকলেও হিন্দু কৃষকের জমি দখল করে মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে লাল সবুজ রঙ একাকার হয়ে গেছে আহিরণে। কেবলমাত্র বিজেপি ওই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির জেলা সভানেত্রী মালা ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, কৃষকদের তিন ফসলি জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কাজ শুরু হয়েছে আহিরণে। আজীবন কৃষকরা পিতৃপুরুষের ওই জমিতে চাষ করছেন। বসবাস করছেন। কিন্তু তাদের কোনওরকম সাহায্য না দিয়ে উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বাধ্য হয়ে সেখানকার কয়েক হাজার কৃষক জোট বেঁধেছেন। তারা কৃষি ও বাস্তু জমি রক্ষার্থে 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিরোধী সমন্বয় কমিটি' গড়ে আন্দোলনে নেমেছে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে আজ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস জোট বেঁধেছে। যে কৃষকদের ভোটে আজ ক্ষমতায় এলো বর্তমান সরকার, সেই সরকারের নির্দেশেই পুলিশ কৃষকদের আন্দোলন করতে দিচ্ছে না। ওই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে একমাত্র বিজেপি। আগামীতেও তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি আমরা।'

আহিরণে নীরবে নিভৃতেই কাঁদল বিচারের বাণী। কোমরে দড়ি বেঁধে বিজেপির জেলা সম্পাদক সুভাষ মণ্ডলকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ।

ঘটনা হলো ১৯৬৪-৬৫ সালে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জমি ক্রয় করেছিল সামান্য দামে। সে সময় বলা হয়েছিল অধিগৃহীত জমির মালিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। অন্যান্যদের পুনর্বাসন দেওয়া হলেও ২৮৮.৩৯ একর জমির মালিকদের কোনও পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। ওই ২৮৮.৩৯ একর জমিতে রয়েছে হিন্দুপ্রধান তিনটি গ্রাম— রসুনপুর, জলাঙ্গাপাড়া ও বাঙ্গাবাড়ি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সে সময় বক্তব্য ছিল ওই জমি ব্যারেজের কোনও কাজে না লাগায় বাসিন্দাদের পুনর্বাসন মেলেনি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেই জমির দখলও নেননি। ফলে পুনর্বাসন না পাওয়ার কারণে এবং জমি ব্যবহৃত না হওয়ায় তিন গ্রামের ২ হাজার ৪৬৯টি পরিবার ওই জমিতেই বসবাস এবং চাষবাস করে আসছে। ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য জমি ব্যবহৃত না হওয়ায় ১৯৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গ্রামবাসীদের জমি ফেরত দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার ইউ এন বালা সেই সময়ের জেলাশাসককে জানিয়ে ছিলেন,

বাঁধ প্রকল্পের জন্য ওই জমি কোনও কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার কারণে উদ্বৃত্ত জমি সরকারি মূল্যের বিনিময়ে পুনরায় গ্রামবাসীদের ফেরত দেবার ব্যবস্থা করতে। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে অধিগৃহীত জমি অব্যবহৃত হয়ে থাকার কারণে পুনরায় তা ফেরত দেবার দাবি জানানো হচ্ছে। ফারাক্কা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের জমি ফেরত দেবার। ফেরত দেবার জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সরকারি অর্ডারের কপি এখনও রয়েছে। তা এখনও বাতিল করা হয়নি। তাই কী করে ওই জমি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিগৃহীত হতে পারে, তাও পুনর্বাসনের কোনও মীমাংসা না করে?

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিগড় ক্যাম্পাসের জন্য ওই তিনটি গ্রাম ছাড়া সরকার অন্যান্য আরও কিছু গ্রাম দখল করতে চাইছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে রেখে কৃষি ও বাস্তুজমি রক্ষার্থে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিরোধী সমন্বয় কমিটির কয়েক হাজার কৃষক সমর্থক সুতি ১ নম্বর ব্লক অফিসে ডেপুটেশনের ডাক দেয়। এই আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে তৃণমূল সিপিএম এবং কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা একসঙ্গে মিছিলে বোমা ছুরি নিয়ে আক্রমণ চালায়। কৃষকেরা এতে উত্তেজিত হলে পুলিশ লাঠি চালায়। অভিযোগ এই ঘটনার পরে পুলিশ গ্রামে গ্রামে ঢুকে চরম অত্যাচার চালাচ্ছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের জব্দ করতে পুলিশ যেভাবে গ্রামে ঢুকে অত্যাচার চালিয়েছিল একইভাবে আহিরণ-ঘোষপাড়া, বহুতালি, কাঁদোয়াসহ কয়েকটি গ্রামে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না গ্রামের মহিলারাও। বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা না দেখিয়েই ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষ মণ্ডলকে। প্রকাশ্য দিবালোকে সিপিএম তৃণমূল সমাজবিরোধীরা আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাচ্ছেন। জেলা পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর হুমকি দিচ্ছেন, তবুও আন্দোলন বন্ধ হয়নি, বন্ধ হবে না। কৃষকরা বলছেন— নন্দীগ্রাম পথ দেখিয়েছে, সিঙ্গুর সাহস দিয়েছে, জঙ্গলমহল মৃত্যুকে বরণ করতে শিখিয়েছে, তাই শত বাধা এলেও পুনর্বাসনের জন্য লড়াই চলবে। জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা আজ ক্ষমতার সিংহাসনে তাঁরাই যখন দরিদ্র কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায় তখন অবাক হতে হয়। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের রক্ষক আহিরণে ভক্ষকে পরিণত হচ্ছে কেবল ভোটের লোভে। কেবল ভোটের লোভে মুসলমান তোষণের ফলেই মুর্শিদাবাদ আজ হিন্দুশূন্য। আগামীদিনে মুর্শিদাবাদ আর পশ্চিমবঙ্গে থাকবে কিনা সে প্রশ্ন উঠতেও আরম্ভ করেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদার সংখ্যালঘু অঞ্চল নিয়ে এই দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলি বাংলাদেশী মৌলবাদী সংগঠনের সহায়তায় দুই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে গোপনে কাজ করছে— এটা ওয়াকিবহাল মহলের অবিদিত নয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ার লক্ষ্যে হিন্দুদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত কি সেই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গমাত্র? যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে একসময়ে দেশবিভাগের চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছিল, তারই একটি ক্যাম্পাস স্থাপন করার জন্য পুনরায় সেই একই খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু মানুষের বাঁধভাঙা ক্রোধ যখন আছড়ে পড়বে তখন তাকে সামাল দেওয়ার সাধ্য কার? এত ক্ষমতা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুর দখল করতে পারেননি, শত গুলি, লাঠি চালিয়েও নন্দীগ্রামকে বশ করা যায়নি। আর আহিরণের দরিদ্র কৃষকের জমি লুঠ করতে পারবেন কি মমতার সরকার? পারলেও সে হবে বড় লজ্জার। □

যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে একসময়ে দেশবিভাগের চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছিল, তারই একটি ক্যাম্পাস স্থাপন করার জন্য পুনরায় সেই একই খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু মানুষের বাঁধভাঙা ক্রোধ যখন আছড়ে পড়বে তখন তাকে সামাল দেওয়ার সাধ্য কার? এত ক্ষমতা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুর দখল করতে পারেননি, শত গুলি, লাঠি চালিয়েও নন্দীগ্রামকে বশ করা যায়নি। আর আহিরণের দরিদ্র কৃষকের জমি লুঠ করতে পারবেন কি মমতার সরকার? পারলেও সে হবে বড় লজ্জার।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

নন্দীগ্রামের নাম এখন 'আহিরণ'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৭-এর ১৪ মার্চের নন্দীগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হলো ২০১২-র ৩১ আগস্ট মুর্শিদাবাদের সুতি মহকুমার আহিরণে। শুধু পাল্টে গেল নাটকের পাত্র-পাত্রীরা। সেদিন অত্যাচারীর ভূমিকায় ছিল সিপিএম, এদিন তৃণমূল। আর সেদিন অত্যাচারিতের পাশে ছিল তৃণমূল, এদিন বিজেপি। তৃণমূলের এহেন অত্যাচারিতের পাশে থাকার ভূমিকা থেকে অত্যাচারীর ভূমিকায় পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য যে মুসলমান তোষণ নীতিরই নবতম অধ্যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কৃষকদের যে আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে মা-মাটি-মানুষের স্লোগান তুলে তৃণমূল ক্ষমতায় এল, সেই নিরীহ কৃষকদের ওপর তৃণমূলী সরকারের বর্বর অত্যাচার তাতে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাদের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন না আহিরণের সাধারণ মানুষ। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের লোভে শতবিরোধ ভুলে তৃণমূলের পাশে কংগ্রেস (মনে রাখুন যে জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে, সেই জেলার কংগ্রেস সভাপতি, প্রবল তৃণমূলবিরোধী অধীর চৌধুরী), মায় সিপিএমও। অন্যদিকে অত্যাচারিত কৃষকদের (বলাই বাহুল্য এঁরা হিন্দু) হয়ে জমি রক্ষার ভার একমাত্র বিজেপি-রই।

রাহুল সিনহা

ঘটনার সূত্রপাত গত ৩১ আগস্ট। তার আগের দিনই কলকাতা থেকে মালদার যাত্রাপথে উমা ভারতীর আসন্ন 'সমগ্র গঙ্গা অভিযান' উপলক্ষে সভা করতে করতে যাচ্ছিলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিনহা। ৩১ আগস্ট ভাগীরথী গেস্ট হাউস থেকে ফারাক্কার উদ্দেশে বেরোনোর পথে 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিরোধী সমন্বয় কমিটির অনুরোধে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বি ডি ও অফিসের সামনে দশ মিনিটের জন্য বক্তব্য রাখতে যান তিনি। বক্তব্য রেখে চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বি ডি ও অফিসের ছাত থেকে বোমা পড়ে সেই জনসভার ওপর। ঝন্টু মণ্ডল সহ দু'জনের পা উড়ে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি। ঠিক নন্দীগ্রামের ধাঁচেই বিনা প্ররোচনায় এরপর আক্রান্তদের ওপরই কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে প্রতিবাদী কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।

এরপর যা ঘটে তা বোধহয় নন্দীগ্রামকেও হার মানাবে। রাতের বেলায় পুলিশ বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের গ্রেপ্তার করে। জেলা সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল সহ ন'জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এঁদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৪৪৭, ১৮৬, ১৫৩এ, ১৫৩বি, ১৫৭, ১৫৮, ১২০বি, ৩৫৩, ৩২৩, ৩৩৩, ৪২৭, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৪৩৫, ৩৭৯ ইত্যাদি ধারায় মামলা করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র দশ মিনিটের ভাষণ দিয়েই এসব দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে যান রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুলবাবু। প্রতিবেদন লেখার সময় ওই ন'জন আপাতত জেলেই রয়েছেন। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁদের পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ বি ডি ও অফিসের ছাত থেকে যে বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা নিক্ষেপ করেছিলেন সুতি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক আর এস পি-র জানে আলম মিয়া। কারণ ঘটনার দিন বেলা এগারোটা নাগাদ ওই প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে ৭-৮ জন লোককে বিডিও অফিসে ঢুকতে দেখা যায়। বোমা পড়ার পরেই বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁদের বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। অতক্ষণ সময় তাঁরা বিডিও অফিসে কি করছিলেন সরকারি তরফে তার কোনও সদুত্তর নেই বলেই এই আশঙ্কা দৃঢ় হচ্ছে। ঘটনার পরেও রাতেরবেলা মুসলমান দুষ্কৃতীরা হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি লাগাতার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

বিজেপি নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, "আক্রান্ত হলো বিজেপি কর্মীরা আর এখন পুলিশ তাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয়নি এটা প্রমাণ করতেই আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের ওপর বুদ্ধি করে তারা কিন্তু কোনও কেস দেয়নি।"

রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহার মন্তব্য, 'আহিরণের কৃষকের পাশে একমাত্র বিজেপি বাদ দিয়ে আর কোনও দল নেই।'

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

অসমে দাঙ্গা

যা অনিবার্য ছিল তাই ঘটেছে। নিম্ন অসমের একটা বিশাল অঞ্চল আজ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে বিদীর্ণ। প্রতিদিন সেখানে মানুষ নিহত ও আহত হচ্ছে। বাড়িঘরে চলছে অবাধে লুটপাট, জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘরবাড়ি, ধর্ষিতা হচ্ছে নারী, লোকজন পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। প্রায় মাসাধিককাল ধরে চলছে এহেন কাণ্ড। সরকার অসহায়— সে রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার। সেনা নামিয়েও অবস্থা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পঞ্জাবকে নিয়ে পাক ভূখণ্ড বিস্তৃত করতে পারলেও পাকপন্থীদের কাছে অসম অধরাই থেকে গেছে। কারণ অসমে তখন জনজাতি হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশকেই করে তারা হাতিয়ার। প্রতিদিন দলে দলে মুসলিমরা স্থল ও জলপথে ঢুকতে থাকে অসমে। বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত দিয়ে তারা ঢোকে অসমের বিভিন্ন স্থানে। তাদের দখলে চলে যায় ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পারের উর্বর বিস্তীর্ণ চর অঞ্চল। একদিকে করিমগঞ্জ ও অন্যদিকে ধুবড়ি- গোয়ালপাড়াকে তারা ব্যবহার করে প্রবেশদ্বার হিসেবে। অতঃপর তাদের ভূখণ্ড দখলের অভিযান চলে চতুর্দিকে। আর এভাবেই তারা একদিন পৌঁছে যায় দক্ষিণ অসমসহ উত্তর-পূর্ব অসমেও (করিমপুর থেকে লখিমপুর এবং ধুবড়ি থেকে দরং)। সশস্ত্র মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে বলপূর্বক দখল করতে থাকে জনজাতিদের জমি, ভিটে ইত্যাদি। ডাকাতি, নারী নির্যাতন, লুটপাট, মারধর, নারী অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, ভয় দেখিয়ে বা নানা অজুহাত তুলে টাকা আদায় ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ ভূমিপুত্ররা বাড়িঘর, জমিজমা ফেলে প্রাণ বাঁচাতে চলে যায় অন্যত্র। ফলে জনজাতি শূন্য গ্রামগুলির দখল নিয়ে নেয় মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অসমে প্রায় দু'কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। বিগত ৬০ বছরে তারা অসমের জনচরিত্র (Demography) পাল্টে দিয়েছে। মুসলিম তোষণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিকদল বিশেষত দীর্ঘদিন রাজ্যক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে, উৎসাহ জুগিয়ে এবং ভোটারলিস্টে নাম তুলে এদেশের নাগরিক বানিয়ে দিয়েছে। তাদের ভোট ছাড়া কোনও দলের পক্ষে ক্ষমতা দখল অসম্ভব। তাই আজ অসমিয়ারা নিজেদের ভূমিতে পরবাসী। একদা সংখ্যার হিসেবে বোড়োরা ছিল রাজ্যে দ্বিতীয় এবং বোড়ো ভূমিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজ তারা সংখ্যালঘু। শুধু অসম নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বোড়ো ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রতিক দাঙ্গা কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘদিনের বোড়োদের প্রতি বঞ্চনা ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিষময় ফল। বোড়োদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। বর্তমানে চলছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তবে অবাক কাণ্ড, অসম দাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে মুম্বইতে মুসলিমরা শুধু হাঙ্গামাই করেনি, দক্ষিণ ভারতে কর্মরত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি মানুষদের দক্ষিণ ভারত ছাড়ারও দিয়েছে হুমকি! এরপরেও মুসলিমরা এদেশে সংখ্যালঘু!

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

আজাদ ময়দানের ঘটনা

অসমের সাম্প্রতিক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মুসলিম মুম্বই-এর আজাদ ময়দানে সভার নাম করে যেভাবে ছোটখাটো একটা দাঙ্গা করেছে তা কংগ্রেস তথা সেকুলারদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে আর হিন্দুদের দিয়েছে তার অস্তিত্বের উপর প্রশ্ন তুলে। এরাই পাকিস্তান বাংলাদেশের টিম ম্যানদের সঙ্গে মিলে এস এম এস সাইবারের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে কর্ণাটক পুণে অন্ধ্র মিলে ৩০,০০০ হাজার বোড়ো হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে। দুইজনকে খুন করেছে, বহু আহত হয়েছে— এদের মধ্যে পুলিশ সাংবাদিক ও অন্যান্যরাও আছে। এটা ১১/৮/১২ তারিখের আজাদ ময়দানের ঘটনা।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র নব নির্মাণ নেতা রাজ ঠাকরে মুম্বই-এর আজাদ ময়দানের সভায় উগ্রপন্থী মুসলিমসহ রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে। ১১/৮-এর আজাদ ময়দানে মুসলিমদের হাতে মার খাওয়া এক পুলিশকর্মী সরকারি ময়দানে উর্দি পরা অবস্থায় রাজ ঠাকরের হাতে ফুল দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সে আর চাকরির পরোয়া করছে না। মিডিয়া বারবার নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গুজরাটে রাজের সাক্ষাতকার দেখিয়েছে। সংবাদমাধ্যম দেখাতে চাইছে যে রাজ ঠাকরে নরেন্দ্র মোদীর মতো হিন্দুত্ববাদী নেতা। তবে গদী কেউ স্বেচ্ছায় ছাড়াতে চায় না— তবে কালো টাকা দুর্নীতির বিরাট বোঝা নিয়ে সোনিয়া কংগ্রেস পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত গদী রাখতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুদের একজোট হতে হবে। মুসলিমদের মতোই একজোট হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে বিপদ অনিবার্য।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উঃ ২৪ পঃ।

নিঃস্বার্থ সেবা

গত ১৭ ও ১৮ আগস্ট এন জে পি (শিলিগুড়ি স্টেশন)-এ ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ খেটে খাওয়া লোক যখন বিশেষ ট্রেনে ফিরছিলেন তখন যে দৃশ্য আমরা দেখেছি তা না জানালে অন্যায় হবে। ট্রেনে গাদাগাদি করে এমনভাবে সবাই আসছে যে পায়খানা প্রস্রাব করতে যাওয়া এক প্রকার অসাধ্য। হকারদের চলার কেন, পা ফেলারও যায়গা নেই।

এই অবস্থায় রেল কর্তৃপক্ষ সামান্য সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন অনুভব করেনি। সামান্য ঘটনায় যারা সেবার জন্য ছুটে যান সেই ধর্মীয় সংগঠন কোনও কারণে অনুপস্থিত। তখন দেবদূতের মতো এসে পৌঁছাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবাভারতী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবকরা। শুকনো বন রুটি, কলা এবং বালতি বালতি পানীয় জল নিয়ে জানালা দরজা দিয়ে পৌঁছে দিল অসহায়, অভুক্ত আতঙ্কিত যাত্রীদের। যা দেখার পর অনেকের চোখ খুলে গেছে, বহু মিডিয়া স্টেশনে এসে সব দেখে শুনে ফটো নিয়ে গেলেও কোন এক অজানা নির্দেশে এই সেবা কাজের বর্ণনা প্রকাশ করেনি।

দু'দিনে কয়েক হাজার মানুষকে আহার এবং জল সরবরাহ করা হয়, প্রথম দিন এই সমস্ত সেবা কাজ ৫/৬ ঘণ্টার প্রস্তুতিতেই শুরু হয়।প্রথম দিন সেবা কাজে রত কোনও স্বয়ংসেবক বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কি জয় ধ্বনি দিচ্ছিল তখন রেল পুলিশ তা বারণ করে, কিন্তু পরদিন যখন সমস্ত ট্রেন থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস-এর জয়ধ্বনি এবং 'বন্দেমাতরম্' 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি উঠেছিল তখন সেই পুলিশদের দর্শন পাওয়া যায়নি। একজন বললেন, নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে দেশভক্তির জাগরণ একেই বলে।

—গৌতম কুমার সরকার, শিলিগুড়ি।

বিপন্ন ভারত ও হিন্দু জাতিকে রক্ষা করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য

কমলাকান্ত বণিক

স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতে উদ্ভূত নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র্যের মাঝে ভারতবাসীরা রাজনৈতিক কারণে নিজেদের মধ্যে কখনও কখনও সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেনি। বিচ্ছিন্নতার চিন্তাও করেনি। এটাই ভারতবাসীদের ঐতিহ্য।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ, মনোরম ভূ-প্রকৃতি, জীবনধারণের স্বচ্ছন্দ পরিবেশ, উর্বর ভূমি বিদেশী বহু গোষ্ঠীকে যুগে যুগে প্রলুব্ধ করেছে। এবং তারা এদেশে এসে এখানকার জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নিজেদের বিভিন্নতা বজায় রাখতে চায়নি বা রাখেওনি। ফলে বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যবশত হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মের মোড়কে 'ইসলাম' নামের একটি মতবাদ আরব থেকে জন্ম নিয়ে মানুষকে 'মোমেন' ও 'কাফের' দুইভাগে বিভক্ত করে পৃথিবীর সর্বত্র সন্ত্রাস ও অশান্তির আগুন জ্বেলেছে। ইসলাম ধর্মানুসারীগণ সামরিক বা অসামরিক যে বেশেই বিশ্বের যেখানেই গেছে, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার মৌলিক কারণেই তারা সেখানকার শান্তি-সুস্থিতিকে নষ্ট করেছে। অপর ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর হামলা চালিয়েছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। ৭১২ খৃস্টাব্দে থেকে মুসলমানরা বিনা প্ররোচনায় আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে বার বার হামলা করে রক্তের নদী বইয়েছে। ভারতবাসীদের মন্দির-মঠ ধ্বংস করেছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করেছে, নারীধর্ষণ ও বলপূর্বক বিয়ে করেছে, এবং কয়েকশ' বছর রাজত্বও করেছে। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজগণ এদেশ জয় করে তাদের হাত থেকে শাসনভার না নিলে ভারতবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদির মুসলমানদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বোধ করি ক্রমেই লুপ্ত হোত। মধ্যপ্রাচ্যে যেমন ঘটেছে। যাই হোক, বৃটিশদের অত্যাচার ও শোষণ যতই থাক তবু একথা সত্য যে, তাদের কাছে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে ভারতবাসীদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন অহিংস ও সহিংস দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনে মুসলমানরা বলা চলে মোটেই আগ্রহী ছিল না। বরং বিচ্ছিন্নভাবে তাদের চেষ্টা ছিল ভারতবর্ষকে পুনরায় মুসলিম শাসনে আনার। তিতুমীর যে বাঁশের কেল্লা বানিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল সেটা ওই চেষ্টারই একটি উদাহরণ। পরবর্তীকালে ইংরেজদের 'কূটনৈতিক মদতে' ১৯০৬ সালে অভিজাত মুসলমানরা মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িক একটি রাজনৈতিক দল এই লক্ষ্যেই গঠন করে, যাতে প্রায় সকল মুসলমানের আন্তরিক সমর্থন ছিল। বস্তুতঃ এই সংগঠনটির মাধ্যমেই বিনা ত্যাগে বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে যুগযুগান্তের অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম করে মুসলিমরা। এবং সেখানে অবস্থিত মুষ্ঠিমেয় হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদি অমুসলমানদের উপর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত হত্যাসহ সকল প্রকার অত্যাচার ও ধর্মান্তরকরণ চালায়। অবর্ণনীয় দুর্দশার ভেতর অমুসলমান নাগরিকরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বেঁচে আছেন। এবং একদা পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশেও হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদির অবস্থা অনুরূপই। যার ফলে হিন্দুরা আজ অবধি চৌদ্দপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে ভারতে এসে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিচ্ছেন এবং কষ্টে আছেন।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ইউনিয়ন স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলমানদের দাবি অনুযায়ী ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হলেও ভারত থেকে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সেখানে না গিয়ে ভারতেই থেকে যায়। এতেই পাকিস্তান দাবির মূল ভিত্তি— মুসলমানরা তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে না, একথা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বরং ভারতে তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হয়েও দাবিদাওয়ার মাধ্যমে নানা আইনী সুবিধা- সুযোগ আদায় করে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের প্রবল প্রতাপে সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। এর অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হিন্দু নেতৃবৃন্দের ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান ও তার অনুসারীদের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না থাকায়, নিজেদের ভীরুতার জন্য, বিশেষত মুসলমান ও তাদের নেতৃবৃন্দের হিংস্র সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে বৃটিশদেরও হাত ছিল। কিন্তু ব্যাপারটির শেষ এখানেই হলো না। বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হলো যাতে ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে ভারতকে খণ্ড করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা যায়। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের অযৌক্তিক ও অন্যায্য দাবির ফলে— শুধু চিরশত্রু একটি ইসলামী প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরই জন্ম হয়নি, উপরন্তু সমাধানহীন বহু জটিল সমস্যা ভেতরে ও বাইরে থেকে অবিরাম ভারতকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখছে। এসব কথা বয়স্করা ভুলেছে এবং নূতন প্রজন্মের প্রায় অনেকেই জানে না। এই অভিজ্ঞতা লজ্জা ও আতঙ্কের। □

পৌরাণিক নগর

হস্তিনাপুর

গোপাল চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতের হস্তিন নামে এক রাজা এই হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতে কুরুদের রাজধানী হিসাবে খ্যাত এই হস্তিনাপুর। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মীরাটের ৩৫ কিমি উত্তর-পূর্বে প্রাচীন গঙ্গার খাতে এই নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ২৯০৯ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৮° ৩' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

মহাকাব্য অনুসারে কুরুক্ষেত্রের রাজারা ছিলেন পুরু-ভরত বংশজাত। কুরুদের সঙ্গে যে পৌরবদের সম্বন্ধ ছিল ঋগ্‌বেদেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। কুরুদেশের সঙ্গে ভরতদের যে সম্বন্ধ ছিল বৈদিক সাহিত্য থেকে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি গাঁথা থেকে জানা যায় যে দেবশ্রবস এবং দেববাত নামে দুই ভরত গোষ্ঠী ছিল, যারা দৃস্‌দবতী, আপয়া ও সরস্বতী নদীর কূলে যজ্ঞ করেছিলেন। এই পংক্তিগুলিতে যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে পরবর্তী সময়ে সেই অঞ্চলই কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। এই কুরুক্ষেত্রের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। Oldenberg-এর মতে ‘‘সংহিতা যুগের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একত্রে ব্রাহ্মণ যুগের বৃহত্তর শ্রেণীতে পরিণত হয়। ভরতেরা সম্ভবত তাদের চিরশত্রু পুরুদের অপেক্ষা বৃহত্তর শ্রেণী কুরুদের জন্য স্থান নির্বাচন করেছিল। কুরুদের এই পবিত্র ভূমির নাম হলো কুরুক্ষেত্র।’’

পরীক্ষিতের পূর্বসূরী হিসাবে মহাভারতে যে সব রাজাদের কুলুজি পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যেও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ রয়েছে। যেমন— পুরু-রবস ঐল, আয়ু, যযাতি, নহুষ, পুরু, ভরত দৌষ্যান্তি সৌদ্যুম্নি, অজমৌধ, ঋক্ষ, সংবরণ, কুরু, উচ্চৈঃশ্রবস্, প্রতীপ প্রাতিসত্বন, বহিলক, শান্তনু ও ধৃতরাষ্ট্র,

বিচিত্রবীর্য। এঁরা প্রত্যেকেই হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতেন। হস্তিনাপুরের রাজবংশের ইতিহাস পরীক্ষিতের পঞ্চম পূর্ব-পুরুষ শান্তনুর সময় থেকে জানা সম্ভব হয়। পরীক্ষিতের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই না। কেবল এইটুকু জানতে পারি যে অনাবৃষ্টি শান্তনুর রাজত্বকালে কুরুরাজ্যকে গ্রাস করতে বসেছিল। পরীক্ষিতের রাজত্বকালে তা দূর হয়ে যায় এবং ‘‘মানুষ পরীক্ষিতের রাজত্বে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত।’’

ধৃতরাষ্ট্রের সময়ে পাণ্ডুর পুত্রেরা ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানীতে চলে গেলে হস্তিনাপুরের গুরুত্ব কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। তবে জিতেন্দ্রিয় বীর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, দাতাকর্ণের মতো বীর ব্যক্তিত্ব হস্তিনাপুরের রাজসভাকে গৌরবান্বিত করেছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হস্তিনাপুরকে বিধ্বস্ত করে। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে আসেন এবং সকলের অনুরোধে বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহন করেন। পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং কর্তৃত্ব লাভের পর শ্রেষ্ঠকীর্তি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান। পাণ্ডবেরা যখন নিঃসপত্ন রাষ্ট্রের অধিকারী তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ-কে সিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে গমন করেন।

অথর্ববেদ সংহিতার বিংশখণ্ডে পরীক্ষিতের যে উল্লেখ আছে তা থেকে জানা যায়, ‘‘পরীক্ষিত ছিলেন কুরু বা কৌরবদের রাজা, যাঁর রাজ্যে দুধ ও মধুর প্রাচুর্য ছিল।’’

পরীক্ষিতের পর হস্তিনার সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র জনমেজয়। মহাভারত অনুসারে এই রাজা এক বিরাট সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এই রাজার তক্ষশীলা অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে।

মহারাজ নিচক্ষুর রাজত্বকালে গঙ্গার প্লাবনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হয়ে গেলে কৌশাম্বিতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। কেউ কেউ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের হস্তি নগরকেই প্রাচীন হস্তিনাপুর বলার পক্ষপাতী। হস্তিনাপুরকে এক অর্থে পাঞ্জাবের বাইরে আর্যদের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ বলা চলে। ▯

গণেশ : এই সময়ের চোখে

রমাপ্রসাদ দত্ত

গণেশ-মূর্তি সংগ্রহ করতেন এক বিখ্যাত বাঙালি। পেশা ছিল তাঁর অভিনয়। নেশা ছিল পড়াশোনা। আর গণেশ সংগ্রহ। তাঁর সংগ্রহ ভরে উঠেছিল বহু বিচিত্র গড়নের গণেশ মূর্তিতে। খুব অল্প দামের গণেশ মূর্তির যেমন সংগ্রহ ছিল, তেমনি অত্যন্ত মূল্যবান গণেশও। তাঁর কাছে সবই ছিল সমান মূল্যবান। বহু বছর ধরে যে শখকে সযত্নে লালন করেছেন তার জন্য কোনও স্বীকৃতি বা প্রচার-প্রত্যাশী হননি কখনও। গণেশ সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ছিল যথেষ্ট। নিয়মিত নানান বই সংগ্রহ করতেন। বই পাড়ায় সুবর্ণরেখার দোকানে ভাঙা রেলিং-এর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কতদিন কথা বলেছেন অনেকক্ষণ কারও কারও সঙ্গে। দেখা গেছে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কমলকুমার মজুমদারকে। দোকানের মালিক ইন্দ্রনাথ মজুমদার গণেশ বিষয়ক কোনও বই পেলেই রেখে দিতেন গণেশ সংগ্রাহকের জন্যে। তাঁর চাহিদার অন্য বইও থাকত। জীবনের শেষপর্বে সমস্ত গণেশ মূর্তি নিঃশর্তে দান করে গিয়েছিলেন। ভারতীয় যাদুঘর সেই দান সাগ্রহে গ্রহণ করে। এই গণেশ-মূর্তি সংগ্রাহকের নাম বসন্ত চৌধুরী। হ্যাঁ। অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী।

আমাদের পরিচিত বিখ্যাত চিত্রকরের নাম গণেশ। ছাত্রজীবনে অন্যের নাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার অভ্যেস অনেকের থাকে। সেটা শিক্ষা ও রুচির ব্যাপার। কেউ কেউ বলত, 'তোর ওই গণেশ নামের জন্যেই চিত্রকর হিসেবে নামডাক হবে না যত ভালো আঁকিস না কেন। আর ওই নামের জন্যে কোনও মেয়ে তোর প্রেমে পড়বে না।' দুটো কথার প্রথমটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে। পিতৃদত্ত নাম 'গণেশ' না বদল করেই চিত্রকর হিসেবে তাঁর খ্যাতি হয়েছে দেশজোড়া। খ্যাতির সূত্রে অর্থও এসেছে যথেষ্ট। দ্বিতীয় কথাটা প্রথমে কিছুটা সত্যি ছিল। একটি মেয়ে তাঁর গণেশ নাম শুনে পছন্দ করেনি। গণেশ ব্যর্থ প্রেমের কাঁটা নিজের বুকে বিঁধিয়ে রেখে কাজকর্মে মেতে থাকতেন। নামডাক হলো তাঁর। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন। অভিজাত মহলের এক ভোজন-সমাবেশে গণেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা ছাত্রজীবনের সেই গরবিনী নারীর। যিনি বিয়ে-থা করে বিদেশে থাকতেন। এক বা একাধিক সন্তানের জননী। গণেশ এখন আর সেদিনের গণেশ নয়। রীতিমতো সেলিব্রেটি। গণেশ তো মনে মনে সেই নারীকেই ধ্যান-জ্ঞান করে সারাজীবন কুমারত্ব বজায় রাখবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবার উল্টো ব্যাপার ঘটল গণেশ-প্রেমে মহিলা ব্যাকুল। 'যৌবনে যাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রৌঢ়ত্বে তাকে নিতে চাই বরণ করে।' মহিলার স্বামী প্রয়াত। পুত্ররা প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের অনুমতি চাইলেন। মিলে গেল। গণেশ সম্মত। গণেশ আর সেই পূর্বপ্রেমিকার বিয়ে হলো। এমন মিলন উপলক্ষে ভোজন সমাবেশে হাজির হয়েছিলেন কলকাতার সংস্কৃতি জগতের নক্ষত্রতুল্য মানুষরা। কেউ কেউ ঠাট্টা করে আড়ালে বললেন, 'গণেশের বুড়ি বউ।' চিত্রকর গণেশ পাইনের বিবাহ-বৃত্তান্ত অনেকেরই জানা।

গণেশ নাম আমাদের চেনামহলে অনেকেরই। একটু সহজ করে ডাক দেওয়া 'গণশা'। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতো বাঘা পণ্ডিতরা হয়তো বলতে পারেন, 'শিবদুর্গা মাঝে মাঝে দুই ছেলেকে ডাকতেন গণশা আর কেতো বলে।' আমরা শিবদুর্গার কথা না জানলেও পাড়ার অনেক কার্তিক তাদের বাবামায়ের কাছে 'কেতো' হয়ে যায়। নামের ওইরকম অপভ্রংশ অবশ্য সকলে পছন্দ করে না। সুরুচিসম্পন্ন মানুষ পুরোনামটাই বলবেন। তাতে শুনতে ভালো লাগে। হাতিমুখ-দেবতা গণেশ। কল্পনাশক্তি কত জোরালো। একটা মানুষের মাথাটা নেই। সেখানে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে হাতির মাথা। গণেশের আসল মাথাটার খোঁজ নিতে আগ্রহী হননি কেউ। হাতির মাথাটা গণেশের দেহকাণ্ডের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। কোথাও একটুও বেমানান ব্যাপার নেই। বরং তা হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশেও। গড়ন বৈশিষ্ট্য বিস্মিত করেছে বিদেশের শিল্প রসিকদের। গণেশ-মূর্তি ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন নকশায়। ঘর সাজানোর উপকরণে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে গণেশমূর্তি থেকেছে। উগ্রবামপন্থী শ্রমিক নেতা চেঁচামেচি করেছে, 'ওই মূর্তি অবিলম্বে সরাতে হবে।' কর্তৃপক্ষ বলেছেন, 'পুজোটুজো নয়। আমরা সাজাবার জন্যে রেখেছি।' নেতাবাবু নাছোড়বান্দা, মূর্তি সরাতেই হবে। কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করলেন অনেক বড়োমাপের বামপন্থীদের সঙ্গে। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি যথেষ্ট উন্নত। ওই শ্রমিক নেতার মতো আহাম্মক নন। তাঁরা একচোট ধমক দিলেন ফটফট করা শ্রমিক নেতাকে। তারপরে সিদ্ধান্ত জানালেন, 'ওই মূর্তি যেমন আছে তেমনি থাকবে। বোকার মতো চেল্লামেল্লি বন্ধ করো।' গণেশের মতো গোলগাল ভুঁড়িওয়ালা চেহারা অনেকের কাছে আদর্শ ছিল। ওই ধরনের চেহারার লোকজন দেখা যেত। এখন লোকজন ফিগার সচেতন। গণেশ মূর্তিকে ধ্যানজ্ঞান করা ব্যবসায়ী কখনও নিজের চেহারাটা ওইরকম করতে চাইবে না। মুড়ি অর্থাৎ মাথা আর ভুঁড়ি ঠিকমতো না রাখলে ব্যবসা দিনে দিনে গণেশজীর কৃপায় লাল হবে কি করে! ব্যবসায়ীরা গণেশ-মূর্তির পুজো করে, একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁর আশীর্বাদে ভাণ্ডার ভরে উঠুক। কয়েকটা লাড্ডু নিয়মিত মূর্তির সামনে ধরে নিজেরা প্রসাদ হিসেবে খেলে মিলে যাবে আত্মপ্রসাদ, দেবতা প্রসন্ন। ওইসব ব্যবসায়ী গণেশ মূর্তির গড়ন বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে রাজি নন। তাঁরা বলবেন, 'পাগল নাকি! ওসব ভাবার সময় কোথায়। মশাই আমাদের ভক্তি স্রেফ টাকার জন্যে। যদি ব্যবসা মার খায় বা গণেশ উল্টে যায় তখন বলবো অত লাড্ডু খাওয়ালাম, আমাকে দেখলে না গণেশ বাবা!' গণেশ পুজো সারা ভারতজোড়া হলেও মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজো অন্যরকম মাতন জাগায়। কতরকম গণেশ মূর্তি তৈরি হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে সবস্তরের মানুষ পরস্পরকে কাছে পায়। তখন মনে প্রশ্ন জাগে মারাঠীদের এত গণেশপ্রীতির উৎস কি? বিঘ্ননাশক দেবতা কি কিছুটা বাড়তি কৃপা করেছিলেন মারাঠীদের প্রতি? তিনি নিজে কি মারাঠী ছিলেন? আবার কেউ কেউ বলছেন মুম্বাই এখন দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী। ব্যবসার সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্যে সেখানে গণেশকে নিয়ে মাতামাতি? ব্যাসদেব মহাভারত লেখার সময় লিপিকর নির্বাচিত করেছিলেন গণেশকে। অবশ্য কোথাও উল্লেখ নেই মারাঠী গণেশ সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন মহাভারত। প্রবল গণেশভক্ত মহারাষ্ট্রবাসীরা অবশ্য কোনওদিনও তেমন দাবি করেনি। □

সিদ্ধিদাতা গণেশ

নবকুমার ভট্টাচার্য

শম্বরাসুর। সেকালের এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের নাম। তার দাপটে স্বর্গ মর্ত পাতাল অস্থির। জনগণ কিভাবে স্থির থাকবে। দুর্গতি দূর হবে কেমন করে, কিভাবে ঘটবে মানব বিজয়ে সিদ্ধিলাভ। চিন্তাক্লিষ্ট পার্বতী তাই একদিন দেবাদিদেবের কাছে এসে জানালেন মনের বাসনা। ওই অসুরটিকে সংহার করার জন্য তাঁর একটি তেজবান পুত্র চাই। মহাদেব বললেন, স্থিতপ্রজ্ঞ হও। তুমি এই প্রজ্ঞাঘন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হলে সেই প্রজ্ঞার ভেতর থেকে এমন এক শক্তি আবির্ভূত হবে যার থেকে জন্ম নেবে গণেশ। সেই প্রজ্ঞাবান শিশুই পরবর্তীকালে পুরুষাকারে উজ্জ্বল হয়ে সর্বসিদ্ধিরূপে উত্তীর্ণ হলেন। গণানাং ঈশঃ ইতি গণেশঃ। অর্থাৎ জনগণের প্রজ্ঞাস্বরূপ। তিনিই গণপতি।

ভগবতী দুর্গা বহুদিন ধরে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় থাকার ফলে তাঁর প্রজ্ঞা থেকে ক্ষিতিতত্ত্বের দেবতা আবির্ভূত হয়েছে। চরাচরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল— ক্ষিতিতত্ত্বই গণেশতত্ত্ব। ক্ষিতির মধ্যে জল অগ্নি পবন আকাশ সমস্ত তত্ত্বই লুকিয়ে রয়েছে। এই ক্ষিতি থেকেই তৈরি হয় খাদ্যসম্ভার। প্রতিটি জীব তাই গ্রহণ করে জীবিত ও সংবর্ধিত হয়। আর জল সেবন না করলে সে প্রজ্ঞান তৈরি হতে পারে না, সেকথা কে না জানে! দেবতারা এহেন রূপ দেখার জন্য এলেন দলে দলে। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন স্বয়ং শনিদেব যিনি আবার গণেশের মারকগ্রহ। তাই শনিদেবের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গণেশের মস্তক ছিন্ন হলো। গণেশজননী মহামায়া তো মর্মে দগ্ধ হতে লাগলেন। বেদনাঘন স্বরে স্বামীকে বললেন, আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাই। মহাদেবকে দয়া পরবশ হতেই হলো। আদেশ দিলেন চেলাদের, যাও উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়ে আছে প্রথম তাকে দেখামাত্র তার মাথাটিই কেটে আনো। সেই মাথাই বসবে ছেলের মাথায়। উত্তর দিকে মাথারেখে শুয়ে ছিল একটি গজশিশু। ত্রিশূল দিয়ে কেটে আনা হলো তারই মাথা। পুনর্জীবিত হলেন সিদ্ধিদাতা। ক্ষিতিতত্ত্বই আবার গন্ধতত্ত্ব। ক্ষিতি থেকেই গন্ধ জন্মায়, সেই গন্ধ আমরা নাক দিয়ে টানি। গ্রহণ করি শ্বাসবায়ু বা প্রাণবায়ু। যা ব্যতিরেকে মুহূর্তকালও বাঁচা যায় না। নাকই এই শ্বাসবায়ু গ্রহণের জন্য। এই শ্বাসের ভেতর দিয়ে মানবের যাবতীয় লাভালাভ। বোধহয় তাই গণেশের নাকটিকে বিরাট করে দেখানো হয়েছে। আসলে শ্বাসবায়ুর ভিন্নতা অনুসারেই মানুষের যত ভাব ভাবনা মনোবৃত্তির বিকাশ। ক্রোধোন্মত্ত মানুষ সাধারণত মিনিটে ৪০টি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের আয়ু হয় খুব কম। হাতির শুঁড় লম্বা। হাতি তাই মিনিটে ৪ থেকে ৬টা শ্বাস নেয়, তার আয়ুও তেমনি ১৫০ বছর। এই গণেশের নাকটি আবার ইচ্ছেমতো চারদিকে ঘোরানো যায়।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। বীর্য ও বলের অধীশ্বর দেবসেনাপতি কার্তিকের সঙ্গে বাঁধল গণেশের ঠাণ্ডা লড়াই। কার্তিক চাইলেন নিজেকে গণেশের চেয়ে বেশি শক্তিমান আর বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে। ঠিক হলো, যিনি আগে সাতবার বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন। কার্তিক আপন বাহন ময়ূরের পিঠে চড়ে ছ'বার বিশ্ব পরিক্রমা করে এসে দেখলেন গণেশ তখনও যাত্রাই করেননি। স্থির হয়ে বসে আছেন মা-বাবার সামনে। জয় সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে কার্তিক সাতবার পরিক্রমায় গেলে গণেশ নিজের ইঁদুর বাহনে চড়ে সাতবার মা-বাবাকে প্রদক্ষিণ করে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। পুত্রের এই প্রজ্ঞাঘন ভাব দেখে মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হয়ে গণেশের ললাটেই বিজয় তিলক এঁকে দিলেন। মহাদেব তো জানেনই যে অধ্যাত্মভাবে বিভোর মেরুদণ্ডের মধ্যে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম ও কটস্থে স্বয়ং শিবশক্তির আবাসভূমি। ক্রিয়াযোগ দিয়ে মেরুদণ্ডের নিচের থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাতবার পরিক্রমা করলেই বিশ্বপরিক্রমা সম্পন্ন হয়। গণেশের বাহন মুষিক হলো ধর্মের অবতার, তার বল বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি সে দ্রুতগামী। আর কার্তিকের ছিল বলবীর্য। খাদ্য থেকেই তৈরি হয় বলবীর্য, তা মানুষের মধ্যে দম্ভের জন্ম দেয়। দর্পের বিস্তার ঘটায়। কিন্তু গণেশ জানেন, সাধনমার্গে থেকে কীভাবে দম্ভদর্পকে নাভিচক্র ও হৃদয়চক্রের ঊর্ধ্বে রাখা যায়। এর ফলে জন্মায় প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞানই যেখানে গভীর। সিদ্ধি সেখানে নিশ্চিত।

গণেশ আবার সৃষ্টির দেবতা। 'গণেশ উপনিষদে' রয়েছে— হে সৃষ্টিকর্তা, তোমায় প্রণাম। তুমি স্রষ্টা, তুমি পালক, তুমি ধ্বংস, তুমি হর্তা। সর্বোপরি তুমিই মূল সত্য। গণপতি বুদ্ধিজীবী। লেখার হাত তাঁর পটু। বেদব্যাসের মহাভারত রচনায় শ্রুতি লেখক হিসেবে তাঁর দক্ষতা স্মরণীয়। আবার মারামারিতেও গণেশ সমান দক্ষ। কারণ বিভিন্ন পুরাণে গণেশের যে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তা হলো— পাশ, অঙ্কুশ, তীরধনুক, চক্র, ছোরা, তলোয়ার, হাতুড়ি, দণ্ড, গদা ও কুঠার। তাঁর একদন্ত নামের কারণও একসংঘর্ষ থেকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণপতি খণ্ডে (৪১-৪৩ অধ্যায়) বলা হয়েছে গণেশ একসময় হরপার্বতীর দর্শনার্থী পরশুরামকে ঘরে ঢুকতে দেননি। ফলে পরশুরামের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়। সেই থেকে তিনি একদন্ত নামে পরিচিত।

প্রাণায়াম সাধনই সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোপদ্ধতি। শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে খেচরী, ভ্রামরী আর বিচারণী অবস্থায় নিজেকে এনে প্রাণ ও অপানকে সমান করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে সবসময় নিজের ভেতর ভগবানকে পূর্ণভাবে যে গণেশের মত উপলব্ধি করতে পারে সেই লাভ করে কৈবল্যমুক্তি। ধর্মতত্ত্বের পরিভাষায় এই নাকি শাম্ভরী মুদ্রা। এই থেকে প্রজ্ঞার উদয় হয়। মানুষ পরিত্রাণ পায়, সিদ্ধিলাভ করে। ▯

হোতু-কোতুর উপাখ্যান

হোতুর কাছে কোতুর ঢাক বাজানো শেখা

হোতুর দলে কোতুর ঢোকার আর একটা কারণ ঢাক বাজাতে শেখা আর তার তালে তালে নাচ রপ্ত করা। হোতু এখন শুধু নিজের ঢাক ভালোমতোন বাজায়। লোকের শুনতে কেমন লাগছে সেসব গ্রাহ্য করে না। কোতু এটা শিখতে চায় আগে। তারপর ঢাকের অন্যান্য তাল এবং বোল শিখে নেবে। সবটাই জরুরি। হোতু বলেছে, 'ঢাক বাজাতে হবে নেচে নেচে। দৌড়তে দৌড়তে। গড়াগড়ি খেতে খেতে। ঢাক বাজানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে বেতালা যেন না বাজে।' ঢাকের বোলে অনেক কথা বলা যায়। যার উপর রাগ তাকে মুখে কিছু বললে সমস্যা। ঢাকে যদি বোল তোলা যায় সুরে তালে, তাহলে বুঝতে সময় লাগবে। যাকে শুনিয়ে বাজানো সে ভাববে কত চমৎকার ঢাকের আওয়াজ। একটু বাদে ক্রমাগত বাজতে থাকা বোল ভেঙে ভেঙে শুনে নেয় তাহলে চমকে উঠে মনে মনে বলবে, 'এ্যাঁ, এতো দেখি আমাকেই গাল দিচ্ছে!' ঢাক তো বেজেই যাবে। তা থামানো কঠিন। তার থেকে সরে পড়া ভালো ঢাকের আওয়াজ যতদূর যায় সেই এলাকা থেকে। কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে যে বাজনা ঢুকে গেছে তা তো আপনা থেকেই বেজে উঠবে। তখন হাওয়ায় ঘুষি চালানো আর দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

হোতু আগে ঢাক পেটাত নেতাবাবুদের, ধর্মকর্তাদের, দুষ্কর্ম নায়কদের। বিভিন্নরকম সুর ছিল। চড়া আওয়াজের সুর বাজলে একরকম দক্ষিণা। আবার একেবারে নিরীহ সুর বাজলে অন্যরকম পারিশ্রমিক। হোতু মনোরঞ্জন-অতিরঞ্জন- ক্রোধবর্ধন— এরকম নানা তালে ঢাক বাজাত। কখনও ঢুলি কাঁসি বাজানোর লোক পাওয়া যেত। অনেক সময়েই হোতু একাই বাজাত। খাটতে পারত। ঢাকের আওয়াজ অনেক দূর অবধি যেত। লোকে আওয়াজ শুনে বুঝে নিত, হোতু বীরদর্পে ঢাক পেটাচ্ছে। দু'চারজন শব্দে জ্বালাতন হয়ে বলত, 'থামাও তোমার শব্দ/আমরা হলুম যে জব্দ!' হোতু থামাতো ঠিক, তবে আগেই বাজানো হয়ে গেছে। বাজনার বোল ছোটোদের মনে একবার গেঁথে গেলে তারা ক্রমাগত নাচবে আর গাইবে। যার বিরুদ্ধে অমন ঢাক পেটানো তারা তো জ্বলবে। রাগে গসগস করবে। হোতু এখন অন্যের পক্ষে বা বিপক্ষে আর ঢাক পেটাতে চায় না। বয়স হয়েছে। দম কমে গেছে। ঢাক নিয়ে নাচতে গেলে হাঁফ ধরে। সে এক কষ্ট। বসে বসে ঢোল বাজানো যায়, ঢাক বাজাতে গেলে শরীরের নড়াচড়া না থাকলে মেজাজ পাওয়া কঠিন। হোতু ঢাক বাজানোর সময় নিজের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় রাখত। পরের পাকাধানে মই দিক লোকে আর তার গোলা ভরাক বেগার মজুররা। এখন হোতুর ঢাক গোলার গায়ে ঝোলে সারা বছর। নামানো হয় না। মাঝে মাঝে চিকলি সাফ করে। কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখে। ঢাকের কাঠি অনেকগুলো আছে, সেগুলোর বয়স হলেও যত্নে থাকে। হোতুর দুঃখ, ঢাক-বাজানো শেখার লোকজন নেই। যে জায়গাতেই যাও উপরে উঠতে গেলে, টিঁকে থাকতে হলে বাজাতে হবে ঢাক। নেচে নেচে বাজিয়েই যেতে হবে। থামলে চলবে না। অবিরাম বাজানোর ফলে লোকের কানে ভালো না লাগুক, সয়ে যাবে। তখন মিলবে স্বস্তি। ঢাকী বুঝবে, এরপর কোনও একটা ফল মিলবে।

কোতুকে বলেছে হোতু, 'ঢাক বাজানোর জন্যে শরীর মনকে তৈরি রাখতে হবে। খুব খাটা দরকার। একটু বাজিয়েই পয়সা নিয়ে সরে পড়া নয়। টানা বাজিয়ে যেতে হবে। ভালো বাজাতে পারলে লোকে টানাটানি করবে। নয়তো পাত্তাই দেবে না। সেরকমভাবে তৈরি হওয়ার জন্যে খাটতে হবে। তোমার তো চালাকি-সর্বস্ব জীবন। কম খেটে বেশি টাকার দিকে নজর থেকেছে বরাবর। ঢাক বাজানোর ব্যাপারে অন্যদের টেক্কা দিতে না পারলে কদর মিলবে না।'

কোতু ঠিক করেছে হোতুর সব বকুনি হজম করবে। না হলে তো বাজানো শেখা যাবে না। কোতু খোঁজখবর নিয়ে একটা ভালো ঢাক আনিয়েছে মেদিনীপুরের সবং থেকে। যার কাছ থেকে কিনেছে সে বলেছে, 'যত খুশি বাজান, বাজবে। শুধু দেখবেন কেউ ফাঁসিয়ে না দেয়।'

ঢাক বাজাতে শেখার আর একটা মতলব আছে কোতুর। শিখতে কোনও খরচ হচ্ছে না। মোটামুটি রপ্ত করে এবার পুজোয় বাজানো যাবে। চিকলি আর শিটুকে দলে নিয়ে ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে কোথাও ভিড়ে যেতে অসুবিধে নেই। ভুলটুল হলে হোতুদা তো আছেই, দেখিয়ে দেবে। কোতু একটা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, 'আসন্ন শারদ-উৎসবে অসাধারণ ঢাকবাদ্য যদি চান তাহা হইলে যোগাযোগ করুন দেরি না করিয়া।' কোতুর সেল ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে।

কোতু চিন্তিত, এখনও ঢাকের ব্যাপারে কারও ফোন এলো না কেন! শিটু বলেছে, 'সবুর করুন, হবে, হবে।' কোতু সেল ফোন এখন কোনও সময়েই বন্ধ করে না।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

রিয়ার প্রতিটি দিনই বইময়

রিয়ার ঠাকুমা মাঝে মাঝেই বই কিনে দিত তিন নাতি নাতনিকে। পল্লব সপ্তর্ষি রিয়া। ঠাকুমার দেওয়া বইয়ে ওদের বইয়ের তাকের অনেকটাই ভর্তি। পল্লব পিসির ছেলে। রিয়ার থেকে অনেকটা বড়। দাদাভাই বলে। রিয়া যখন ঠিকমতো পড়তে পারত না তখন কত বইয়ের গল্প পড়ে শুনিয়েছে। রিয়া তখন কিছু বুঝত, কিছু বুঝত না। চোখ বড় বড় করে শুনত। দাদাভাইয়ের টেবিলে বসে সে কত কিছু পড়ত লিখত আপনমনে। দাদাভাই একটুও রাগ করত না। দাদাভাইকে কোনও কারণে পিসি কিংবা পিসেমশাই বকলে রিয়া রীতিমতো ঝগড়া করত দাদাভাইয়ের পক্ষ নিয়ে। আদরের ভাইঝির ভাবভঙ্গি দেখে রাগ উবে যেত পিসির। হেসে ফেলত। কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলত, 'আমার মা-মণি।' ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর থেকে পিসি সবসময় তাকে বলে 'মা'। কখনও কখনও আদর করে বলে 'রাই।' পিসেমশাইকে ওরা দুই ভাইবোন বলে 'মশাই'। পিসেমশাই বলে 'আমার মা।' যেদিনই আসে বইটই আনে রিয়ার জন্যে তার দাদার জন্যে। সেইসঙ্গে খাবার দাবারও থাকে। খাবার শেষ হয়ে যায়। বই থাকে। রিয়ার বই পড়ে দাদাই, বাবা মা দাদা। অনেক সময়ে রিয়ার পড়তে ইচ্ছে করে না। বাবাকে বলে, 'তুমি পড়ো, আমি শুনি।' মায়ের বাবাকে ওরা দুই ভাইবোন ডাকে 'বাপি' বলে। মা 'বাপি' বলে বাবাকে। মায়েরও মা নেই। রিয়াকে মা খুব ভালোবাসে। বাপি বই আনে প্রতি সপ্তাহে। সঙ্গে মিষ্টিও থাকে।

—বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ও মৃত্যু কবে? কত বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন? কার সঙ্গে কীভাবে?

২. 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' বইটি কার লেখা? ছদ্মনামের আড়ালে থাকা লেখকের নাম কি?

৩. 'শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না'—একথা কে লিখেছেন? কোন্ বইয়ে আছে?

৪. বাংলা ভাষায় যতিচিহ্ন কে প্রথম ব্যবহার করেন? আগে কি ছিল?

৫. কোন কবির দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন?

উত্তর ১. ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০—২৯ জুলাই ১৮৯১। আট বছর। বাবার সঙ্গে। ৬০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে। ২. ইন্দ্রমিত্র। অরবিন্দ গুহ। ৩. বিদ্যাসাগর। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে। ৪. বিদ্যাসাগর। দাঁড়ি আর ডবল দাঁড়ি। ৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

গোপাল ঘোষ ভালো ময়রা। কত ঘটি দুধে কত ছানা হয় আর কত ছানায় কত সন্দেশ রসগোল্লা হতে পারে সব মুখস্থ। তার মধ্যে যা যা ভেজাল দেওয়া দরকার সব মনে থাকে। দোকানের কোনও মিষ্টি বাড়িতে ঢোকে না। গোপাল ঘোষের বউ বলেছে, 'একমুখে বলছে খদ্দের লক্ষ্মী আর অন্যদিকে তাদের ঠকাচ্ছে। অমন দোকানের জিনিস বাড়িতে ঢুকবে না।' দোকানের মালিক গোপাল বাইরে যত দাপট দেখাক ঘরে কেঁচো। বাড়ির মিষ্টি আসে খুব নামকরা দোকান থেকে। সে দোকানের মিষ্টি সত্যিই ভালো।

গোপাল জানে, মিষ্টি দোকান থেকে এলে কেনার খরচ বাঁচত। টাকা তারই যাচ্ছে। কিন্তু জেদের বশে বাড়িতে মিষ্টি খায় না। তার জন্যে বরাদ্দ মিষ্টি নাতি নাতনিরা খেয়ে নেয়। গোপাল একদিন চুপিচুপি সেই নামী দোকানে খেতে গিয়েছিল। বউ দেখে বলল, 'এবার নিজে বলো কেমন খেতে!' ধরা পড়ে চুপ করে রইল গোপাল।

।। ২ ।।

বেশ যত্ন করেন দাড়ির অজয় গুপ্ত। অনেক বছরের দাড়ি। আঠারো বছরে গজিয়েছিল। কোনওদিন কাটেননি। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের সময়েও কাটেননি। যুক্তি ছিল, 'আমাকে হরদম বিদেশ যেতে হয়। পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে মিলবে না। মুশকিলে পড়বো।' এক ধর্মবিশ্বাসী দাড়ি-অনুরাগ দেখে বললেন, 'আপনার এই দাড়ি মানসিক রাখছেন?' অজয় রসিক লোক। বললেন, 'না, এ আমার কায়িক দাড়ি।'

—রামগরুড় সংকলিত

সেচ বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্তা বাঙালি তনয়া

ইন্দিরা রায়

পশ্চিমবাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সেখানে শস্য শ্যামল খেত সকলকে মুগ্ধ করে। এখানকার গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। চাষ করে ফসল ফলিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে তারাই। অবশ্যই তারা সমাজবন্ধু। কিন্তু এক সময়ের সেই সোনার বাংলা আজ আর নেই। এখন চাষ-আবাদের জমি বেশিরভাগ চলে যাচ্ছে শিল্প তৈরিতে। চাষীরা চাষ করেও সে ফলন ফলাতে পারছে না। যুগের তালে প্রকৃতিতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। সময়ের বৃষ্টি নেই। খরায় ফুটিফাটা হয়ে পড়ছে চাষের জমি। যদিও আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে চাষের ক্ষেত্রে এসেছে অনেক উন্নতমানের প্রযুক্তি। কিন্তু উৎকৃষ্ট ফলনের জন্য যা আশু প্রয়োজন, যার জন্য কৃষকদের তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে চাতক পাখির মতো সেটা হলো বৃষ্টির জল। সারেরও যোগান নেই সেইমতো। সারের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মাথায় হাত। তাদের মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাছে বহু আশায় বুক বেঁধে নিজেদের কথা সরাসরি বলার ক্ষেত্রেও বাধা। গণতন্ত্রের গণকণ্ঠ রোধ করার তীব্র প্রচেষ্টা। যার ফলস্বরূপ ঘটে চলেছে একের পর এক কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা।

কিন্তু বাঙালি যারা, তাদের অন্তর কাঁদে বাংলার জন্য। যারাই আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, তাদের দিকে কেউ, বিশেষত সরকার মুখ তুলে দেখছে না। এমনই এক বাঙালি তনয়া বাংলার বাইরে চাকরিসূত্রে প্রবাসী হয়ে থেকেও বাংলার চাষী ভাইদের জন্য, চাষের জন্য এমন এক পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা সারা বাংলা নয়; সারা ভারতবর্ষের কাছে গৌরবের বিষয়। সেই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানীয় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তিনি।

বাংলা তথা ভারতীয় তনয়া অদিতি মুখার্জি দিল্লীতে গবেষক-বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। 'ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের'

অদিতি মুখার্জি

ওপর রিসার্চ করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, নর্মান বরলাগ (Norman Borlaug)-র পরই; যিনি ভারতের সবুজ বিপ্লব-এর জনক হিসেবে পরিচিত। অদিতি মুখার্জি গবেষণার বিষয় সম্পর্কে নিজেই বলেছেন— আমি চাষের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা আছে সেচব্যবস্থায়, সেগুলো দূর করার গবেষণা করেছি, যাতে, আমাদের চাষের ব্যবস্থা উন্নততর হতে পারে। এতে সবাই উপকৃত হবে। যদিও হরিয়ানা পাঞ্জাবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি; কিন্তু আজ বেশ কিছু বছর ধরে তুলনামূলকভাবে জলের অভাব ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে; বিশেষত চাষের ক্ষেত্রে। জানালেন গবেষক অদিতি মুখার্জি।

অদিতি মুখার্জি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, দিল্লীর জে এন ইউ থেকে পড়াশোনা করেছেন। গবেষণা করেছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে দিল্লীর 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট'-এ গবেষক হিসেবে নিযুক্ত।

নর্মাল বরলাগ পুরস্কার অত্যন্ত সম্মানীয় পুরস্কার, যা এবছরে 'দ্য ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশন' ঠিক করেছে বাঙালি কন্যা অদিতি মুখার্জিকে তার মূল্যবান গবেষণার জন্য তার হাতে তুলে দেবে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৯০,০০০। অদিতির এই গবেষণালব্ধ কাজে পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হবে এবং সরকারকেও আরও উন্নততর চাষের কাজে তৎপর হতে সাহায্য করবে। আগামী ১৭ অক্টোবর ইউ এস-এর আয়োতন তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার পঁয়ত্রিশ বছরবয়সী বাঙালি রমণীর প্রাপ্তিতে বাংলার শুধু নয়; বিশ্বের মহিলাদের কাছেও এক পরম প্রাপ্তি। ▯

('হিন্দুস্থান টাইমস' থেকে সংগৃহীত)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে
মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

লালা হরদয়াল নামাঙ্কিত গ্রন্থাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিষয়টা যে কীভাবে শুরু করি, তা ভেবে উঠতে পারছি না। মানে সার্ধশতবর্ষে পদার্পণ একটি সংস্থার ব্যাপারটায় তেমন অভিনব কিছু নেই। তবে এটা ঠিক সংস্থাটি যদি গ্রন্থাগার হয় তবে তা নিঃসন্দেহে স্থানীয় মানুষের সমীহ আদায় করতে বাধ্য। এরকমই একটি লাইব্রেরীর নাম হরদয়াল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৫২ সালে। দিল্লীর চাঁদনিচকের ব্যস্ততম এলাকায় ক্রিম রঙের গম্বুজাকৃতি বাড়িটির চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সন্দেহ নেই দিল্লীর প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এরাজ্যেও এধরনের বা এর চেয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। খোদ দিল্লীতেও তো এধরনের কত লাইব্রেরী-ই রয়েছে। কিন্তু সারস্বত সমাজে এসব গ্রন্থাগারগুলি অনন্য সম্মানের অধিকারী হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের যে খুব একটা কাজে লাগে তা কিন্তু বলা যায় না। কারণ এখানকার বইগুলি মান্ধাতার আমলের, গবেষকদের খুব কাজে আসতে পারে, আম-স্কুল পড়ুয়ার তাতে লাভ কি? দ্বিতীয়ত, প্রাচীনত্বের কারণে অনেক বই-ই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। ফলে গ্রন্থাগার-গৃহের সংস্কার হলেও 'গ্রন্থাগারে'র কোনও সংস্কার না হওয়ায় এসব প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু যায় আসে না।

সে না আসুক। তাদের কথা ভাববার সময়-টময় কই আমাদের? বাজারে বিস্তর বই-টই পাওয়া যায়, কিনে পড়ে নিলেই তো পারে গোছের মনোভাব আমাদের। আর ঠিক এখানেই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হরদয়াল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিটি। সম্প্রতি এরাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি কী কী কাগজ নেবে তার নির্দেশিকা জারি করায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এর পেছনে আসল কারণ যাই থাক, সরকারিভাবে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সংকটের কথাই বলা হয়েছিল। হরদয়াল গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক মধুকর রাও-এর তথ্যে লজ্জিত হওয়া উচিত এরাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগের। তিনি জানালেন, ইংরেজি, হিন্দী, পাঞ্জাবি মিলিয়ে ৭২টি সংবাদপত্র ও পাক্ষিক নেন তাঁরা। আর স্রেফ এই কারণেই সকাল-বিকেল নিতান্ত 'প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারে ভিড় জমান পাঠকরা। তা বলে একে হট্টমন্দির বলে ভেবে বসবেন না। নীরবতার ব্যাপারটি এই গ্রন্থাগারে সর্বদাই গুরুত্ব পায়। ১৯৭৩ সাল থেকে এই গ্রন্থাগারে কর্মরত রাও। তিনি জানালেন, "আগে আমাদের অধিকাংশ পাঠক-ই ছিলেন পেনশনভোগী এবং অফিসে কর্মরতরা। এখন আমাদের পাঠকরা কিন্তু অধিকাংশই ছাত্র। যারা পড়াশুনোর জন্য নিরালা একটা জায়গা খোঁজে।" অর্থ সংকট যে আসেনি তা নয়, এমনকী অর্থাভাবে বন্ধ হওয়ারও উপক্রম হয়েছিল। তিনভাগে বিভক্ত হওয়া দিল্লী পুরসভার প্রতিটি খণ্ডই এগিয়ে এসেছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগারটিকে রক্ষা করতে। তাদের অর্থানুকূল্যে রাজধানীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরমভরসাস্থল হয়ে উঠতে পেরেছে হরদয়াল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি।

এই মুহূর্তে গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। এর মধ্যে ৮০০০ গ্রন্থ 'দুর্লভ' তালিকাভুক্ত। এর মর্যাদা বাড়িয়েছে ট্রাভেইলি বেগভেনের রিলেশস অব্ সাম ইয়ারস (১৬৩৪), স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সত্যার্থ প্রকাশ (১৮৮১) এবং একজন পার্শী অর্থাৎ আবুল ফজলের মহাভারত। একে শুধু গ্রন্থাগারের তকমায় আবদ্ধ না রেখে 'হেরিটেজ মনুমেন্ট'-এর সম্মানও দিচ্ছেন গবেষকরা। এর নামকরণের ইতিহাসটা জাতীয়তাবাদী মানুষকে খুশি করবে নিশ্চয়ই। এর নাম প্রথমে ছিল লরেন্স ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি। ১৯১২ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ চাঁদনিচক বাজারের ওপর দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে যাবার সময় তাঁর ওপর বোমা নিক্ষেপের পর লাইব্রেরিটি তাঁর নিরাপত্তার জন্য অন্য বড় বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর নামেই নামাঙ্কিত হয়। মজার ব্যাপার ভাইসরয়ের ওপর ওই বোমা নিক্ষেপের মূল পাণ্ডা লালা হরদয়ালের নামেই পরিচিত হয় গ্রন্থাগারটি।

বর্তমানে দিল্লীতে হরদয়াল মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের শাখা রয়েছে ৩১টি। এদের অধিকাংশেই শুধু রিডিং-রুমের সুবিধা রয়েছে। বিগত কয়েকবছর ধরে গ্রন্থাগার সংস্কারের কাজ চলছে। ভারতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সংস্থা আসবাবপত্র, ছবিওলা দেওয়াল ও কম্পিউটার দিয়েছে বিনামূল্যে। দুষ্পাপ্য বইয়ের মাইক্রোফিল্ম করে রাখার কাজও শুরু হলো বলে। সরকারি ঔদাসীন্যে টাকাটা সমস্যা সৃষ্টি না করলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে 'হরদয়াল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি' যে বড় ভূমিকা নেবে তা বলাই বাহুল্য।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(রে
মাত্র দুই মিনিটে (ক্ষী)র তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

ইউ পি এ-র সঙ্কটে অন্যরা কি প্রস্তুত?

অতিথি কলম

ডঃ জে কে বাজাজ

ড. জে কে বাজাজ

কেন্দ্রে পর পর দুবার ক্ষমতায় আসীন ইউ পি এ। ইউ পি এ-র দ্বিতীয় পর্ব দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে গেছে। এই জোটের রাজনৈতিক পরিকল্পনা কিংবা রাষ্ট্রপরিচালনায় এতটাই সিদ্ধান্তহীনতা ও ব্যর্থতা যে কার্যতঃ যারা এই জোটের বা সরকারের সমর্থক তারাও এই সরকারের সমালোচনায় মুখর। একটা সাধারণ ধারণা চালু হয়ে গেছে যে, এই সরকার এক পুতুল সরকার, সরকার পরিচালনায় ধ্যান-ধারণার বালাই নেই, নীতি নির্ধারণ ও তা রূপায়ণে অপারগ অথবা রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বিকভাবে ব্যর্থ। অনেকেরই আশা ২০১৪ সালের নির্বাচনে দেশবাসী এই অপদার্থ সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, সেই স্থান পূরণ করবে জাতীয়তাবাদী সরকার।

যদিও অনেকেই এই ধারণা পোষণ করছেন তবুও ভোটের বা ভোটারদের মতিগতি দেখে এখনও প্রত্যয় হচ্ছে না যে, এই আশা সত্যিই পূরণ হবে ২০১৪ সালে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। মুসলমান ও খৃস্টান সংখ্যালঘুরা যারা গোপনে ধর্মান্তরিত হচ্ছে বা হয়েছে তারাই এখন জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর ২০ শতাংশ বা তার বেশি। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য গোষ্ঠী বিশেষতঃ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী। অন্যদিকে অতি শিক্ষিত বা ধনিকশ্রেণী ব্যক্তিবর্গ যারা হিন্দু সমাজেরই অপর এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী।

ইউ পি এ নির্লজ্জভাবে এবং নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যে, তারা হলো সংখ্যালঘুদের সরকার। এটা এমন-ই সরকার যার প্রধানমন্ত্রী জনসমক্ষে সরাসরি বলছেন যে, জাতীয় সম্পদে প্রথম দখলদার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। সেই ২০০৬ সাল থেকে এই সরকার ১৫ শতাংশ অর্থ বিভিন্ন সংখ্যালঘু প্রকল্পে বরাদ্দ করেছে। শুধু তাই নয়, এই সরকার তার নিজস্ব উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করেছে বিশেষতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। সংখ্যালঘুদের জন্য এই সরকার এক পৃথক মন্ত্রক তৈরি করেছে যার শীর্ষে রয়েছেন এক সংখ্যালঘু ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এক খৃস্টান ব্যক্তি। আবার এই মন্ত্রক তৈরি করেছে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ এবং অর্থ পর্ষদ এরা আবার মৌলানা আজাদ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের জন্য অর্থের জোগান দিচ্ছে।

> “ইউ পি এ নির্লজ্জভাবে এবং নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যে, তারা হলো সংখ্যালঘুদের সরকার। এটা এমন-ই সরকার যার প্রধানমন্ত্রী জনসমক্ষে সরাসরি বলছেন যে, জাতীয় সম্পদে প্রথম দখলদার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। সেই ২০০৬ সাল থেকে এই সরকার ১৫ শতাংশ অর্থ বিভিন্ন সংখ্যালঘু প্রকল্পে বরাদ্দ করেছে।”

যখন আমরা কেন্দ্রের নীতি পর্যালোচনা করব তখন দেখব যে, জাতীয় মূলস্রোতকে অবজ্ঞা করে সরকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মূলধারার বিজ্ঞ মানুষদের ব্যবহার করে সম্প্রদায়গতভাবে দেশকে বিভক্ত করছে। সরকার তার ওয়েবসাইটে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। তাতে সরকারিভাবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নব্বইটি জেলা ‘এ’ ক্যাটিগরির, ‘বি’ ক্যাটিগরিতে ১২২৮টি এবং সি ডি ব্লকেও ৩৫৮টি ছোট শহর চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে সরকার নির্লজ্জভাবে ওইসব অঞ্চলে অর্থের জোগান দিচ্ছে উন্নয়নের জন্য।

সরকার নীতি নির্ধারণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও কিন্তু সাম্প্রদায়িক নীতি নির্ধারণে কোনও কার্পণ্য দেখায়নি। সংখ্যালঘু সংখ্যা গত কয়েকদশক ধরে উল্লেখযোগ্যভাবে লাগাতার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন দশক ধরে বিশেষত মুসলিম সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব বাড়ছে। বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ তাদের কাছে সঠিক সময়ে এসেছে এবং স্পষ্টতঃ দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষভাবে অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। দৈবক্রমে নয় যে ডাক্তারির স্নাতকস্তরে ৭২ জন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছে দেশের নামজাদা প্রতিষ্ঠান এইমস (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্স)-এ এবং এদের মধ্যে ১২ জনই হলো কেরল থেকে আগত মুসলমান ছাত্র। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে সংখ্যালঘুদের জন্য সরাসরি সংরক্ষণ অথবা তাদের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ। সরকারি তরফে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়

সরকারি অনুদান মিলছে এদের। খৃস্টানরা অবশ্য নিজেদের উদ্যোগেই উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করছে।

স্বভাবতই এরা সরকারের ওপর খুশি। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ, দুর্নীতির দায়ে জর্জরিত হয়েও এই কুড়ি শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট এদের পক্ষে একরকম নিশ্চিত। রাজ্যস্তরে পরিণাম ভিন্ন হলেও সংখ্যালঘুরা তাদের স্বার্থ কতটা কোথায় সুরক্ষিত তা বিবেচনা করেই রাজ্যস্তরে সরকার বা তার জোট শরিকদের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও কেন্দ্রে সরকারের পক্ষে অবিচল। এরকমটাই ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিকতম নির্বাচনে। কিন্তু সংসদীয় নির্বাচনে এরকম বিভিন্ন ফল ঘটবে না। কিন্তু নির্বাচনী খেলা যেভাবে সংগঠিত হচ্ছে তাতে এই কুড়ি শতাংশ ভোট এককাট্টা একটি জোটের পক্ষে গেলেও সেই জোটকে পরাস্ত করা খুব অসম্ভব নয়।

প্রধান বিরোধীদল যদি সরকারি এই সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে গিয়ে জাতীয় মূলস্রোতের ভোটব্যাঙ্ককে আশ্বস্ত করতে পারে যে, সরকারি সংখ্যালঘু তত্ত্বের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবে তারাই তবে ফলটা উল্টে যেতে পারে। কিন্তু মনে হয় না তা হবে বিভিন্ন কারণে। যেমন প্রধান বিরোধী দল বুঝতে পেরেছে যে, তত্ত্বগতভাবে হিন্দু ভোট একত্রিত করা অসম্ভব কাজ এবং স্বভাবতই তারা এতে সচেষ্টও নয়। এছাড়া দলের অভ্যন্তরে এবং সঙ্গীরাও তাদের সংখ্যালঘু তাস দেখাতে তৈরী। তাই দলগতভাবে দলকে এইসব বিষয়গুলিকেও বিবেচনার মধ্যে আনতে হয়, ফলে বর্তমান সরকারের এই নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারছে না প্রধান বিরোধী দল। এ ধরনের নীতি গ্রহণ করতে নেতৃত্ব এরকম বাধ্য এবং এই বিচারকে অবশ্যই মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু হিন্দু ভোট একত্রিত করার প্রচেষ্টায় খামতি রেখেও অন্য দলের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট উপেক্ষা করে নির্বাচনে জেতা কঠিন। কারণ শাসক দল ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু ভোট পেয়ে যাচ্ছে। যদি প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী হিন্দু ভোট একত্রিত করার নীতি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ করে তা হবে ইউ পি এ-র বিরুদ্ধে কড়া নির্বাচনী মোকাবিলা।

এছাড়া ইউপিএ-র বিরুদ্ধে কড়া রাজনৈতিক নীতি এমন ভাবে গ্রহণ করতে হবে যা বর্তমান সরকার তৈরি করেছে। এমন সব ইস্যু রয়েছে যার জন্য সরকারের ভ্রান্ত নীতি-ই দায়ী। এরকম একটি ইস্যু হলো সীমাহীন দুর্নীতি এবং আর্থিক উন্নয়নের অবনমন যার দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন। এই দুই সংকটে যা ইউ পি এ সরকারের আমলে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার, সমাধানের উপায় কী?

ভারতে দুর্নীতি প্রথাগত। একগোষ্ঠী বা ব্যক্তি অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তি-র কাছে সহজেই বিক্রয়সাধ্য হতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় শাসনপদ্ধতির সঙ্গে দুর্নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই প্রথায় যেমন একজন দূরসঞ্চার মন্ত্রী বা খনি বা অসামরিক বিমান মন্ত্রীর লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা রয়েছে এবং তা তৎপরতার সঙ্গে কয়েক হাজার কোটি টাকায় বাজারে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে অথবা এই লাইসেন্সের বিনিময়ে বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সংস্থা বা ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ তছরূপ হচ্ছে আরও চড়া হারে। এইরকম যখন স্থিতি তখন কোনও মন্ত্রী এমন বোকা নয় যিনি নিজের জন্য বা দলের জন্য অর্থ চাইবেন না তার কাছ থেকে যাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথাকে খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়ে কিছুটা শোধরানো গেলেও দুর্নীতিমুক্ত প্রথা চালু করতে গেলে সামগ্রিকভাবে সমস্ত প্রথা-পদ্ধতি খোল-নলচে পাল্টে দিতে হবে।

এই পদ্ধতিতে দুর্নীতি কেবল উচ্চস্তরেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা একেবারে নীচুস্তর যেমন পুলিশের সিপাহীস্তরে, আদালতের পেশকার বা সরকারি দপ্তরের সাধারণ কেরানীস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে বিস্তৃত। এইসব দপ্তর যেহেতু বিদেশী শাসকদের অধীন এবং এইসব দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে উদ্যোগী, তাই তৎকালীন সরকার এইসমস্ত ঘটনা উপেক্ষা করেছে। স্বাধীনতার পরেও ব্যবস্থায় উন্নতি তো হয়নি, উল্টে তা বিস্তারলাভ করেছে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে কেউ যদি সততার লেশমাত্র নিদর্শন স্থাপন করতে চায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দুর্নীতি নির্মূল করতে চাই সরকারি প্রথায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং শাসন পদ্ধতির সংস্কার। কেউ কি এই সংস্কার কেমন হবে তার নকশা রচনা করেছেন?

বেহাল আর্থিক দশার উন্নয়ন আরও বেশি কঠিনসাধ্য। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃষি ও উৎপাদন শিল্পকে উপেক্ষা করে আসছি। আমরা উন্নয়নের পরাকাষ্ঠা হিসেবে পরিষেবাকে চিহ্নিত করেছি। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি তথ্য সঞ্চার সেবাকে। এই ক্ষেত্রটি বিদেশী পুঁজিভিত্তিক। বিদেশী পুঁজি আর তাদের প্রয়াস উঁচুহারে দাবি করছে তাদের লভ্যাংশ। অর্থনীতির গতি নিম্নগামী এই কারণে যে বর্তমান সরকার কর-চুরি, ফাঁকি দিতে উৎসাহ দিচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের। বর্তমান সরকার বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের হাতে খুচরা বিপণন ব্যবস্থা তুলে দিতে চাইছে। অভ্যন্তরীণ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশীদের সুযোগ করে দিতে সরকার যখন ব্যর্থ, মাঠে তখন অবতীর্ণ স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা। বর্তমান সরকার যেন নতজানু এবং তা প্রতীয়মান হচ্ছে যেভাবে নতুন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমকে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রধান বিরোধীদল এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করছে? এরাও কি উঁচু হারের আর্থিক উন্নয়ন ধরে রাখতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তৈলমর্দন করবে? বা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এদের পৃথক কর্মপন্থা রয়েছে?

বর্তমান জোট সরকার বেহাল। কিন্তু উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তারা? ওপরে বর্ণিত ইস্যুগুলির সমাধানে তারা কতটা তৎপর। এইসব ইস্যুগুলি সমাধান কেবল রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য নয় বরং তা দেশের মঙ্গলের জন্য। এই ইস্যুগুলি সত্বর সমাধান করা প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যাতে আমরা এক সমৃদ্ধ প্রগতিশীল দেশ, জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি বিশ্বদরবারে।

(লেখক সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের অধিকর্তা)

জন্মেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ

অথঃ কমিউনিস্ট চরিত্রকীর্তন

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

কুরুকুলপতি জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মুনিবর, আমি চতুর্বেদস্রষ্টা ব্যাসদেবের কাছে শুনেছি, এই ভারতবর্ষে কলিযুগে কম্যুনিস্ট নামে একটি দলের উত্থান হবে। এরা বর্বর হিংস্র এবং কুচক্রী হবে। এদের সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জন্মেজয় চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, সে কি, এরকম হয় না কি।

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, হয় না কি— হবে। পঙ্গপাল যেমন সবুজ শস্যক্ষেত্র মরুভূমিসদৃশ করে দেয় এরা তেমনি নির্দ্বিধায় ভারতকে নিঃস্ব করে দেবে।

জন্মেজয় উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, মুনিবর, শুরুতে এদের সম্বন্ধে যা বললেন আপনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র বিশারদ। আপনি যদি এদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন আমি খুশী হব।

চন্দন বৃক্ষ থেকে কখনও বিষের উদ্ভব হয় না। বিষ বৃক্ষ থেকে বিষই উৎপন্ন হয়। মার্কসের মতবাদ কখনও মহান ছিল না। তাঁর মতবাদ মধ্যযুগীয় এবং বর্বর। এই মতবাদের মূল হলো হিংসা, কাণ্ড হলো অত্যাচার, শাখা-প্রশাখা হলো বিচ্ছেদ, ফল হলো আত্মবিনাশ।

বৈশম্পায়ন স্মিত হেসে বললেন, মহারাজ, আপনি মন দিয়ে শ্রবণ করুন। শক, হুণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতির মতো কম্যুনিস্টরাও এক হিসেবে বহিরাগত। এক হিসেবে বললাম এইজন্য যে কম্যুনিস্টরা স্বদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এদের আদর্শ, মতবাদ বিদেশ থেকে নেওয়া, এরা বিদেশের অঙ্গুলি নির্দেশে চলবে, স্বদেশ ধ্বংস হলো কিনা তাতে একটু চিন্তা বা দুঃখ থাকবে না। এবং সত্যি সত্যি এদের প্রতিটি কাজই দেশের স্বার্থের বিরোধী হবে। দেশ উচ্ছন্নে গেলেও এদের কিছু আসবে যাবে না।

তাতে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হচ্ছে, আমার শিরোঘূর্ণন হচ্ছে, হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। আপনি এদের সম্বন্ধে বিশদ বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন, এইটুকু শুনে আপনি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন, বিশদ শুনলে ত আপনি সংজ্ঞা হারাবেন। আপনি রাজচক্রবর্তী, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আপনাকে ধৈর্য ধরে অপ্রিয় কথা শুনবার জন্য মনে শক্তি আনতে হবে।

জন্মেজয়-এর মুখমণ্ডল লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তিনি আত্মসংবরণ করে বললেন, না না, মুনিবর, আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন চক্ষু মুদ্রিত করে বললেন, মহারাজ, শক, হুণ, পাঠান, মোগলদের মতো এদের ভাবধারা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী, এবং স্বাভাবিক কারণেই পাঠান-মোগলদের বংশধর মুসলমানদের পরম বন্ধু হয়ে ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে হিন্দুদের ধ্বংস করা এবং ভারতে মুসলিম-কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত করা।

জন্মেজয়ের মুখমণ্ডল ক্রোধে ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের আকাশের মতো গম্ভীর হলো, চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল, তাঁর নাসিকা থেকে বিষধর সর্পের শব্দের মত শ্বাস বাহির হতে লাগল। তিনি বললেন, আপনি তথ্য সহযোগে একটু বলবেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, বলছি, শ্রবণ কর। হিন্দুদের নেতৃত্বে বৃটিশদের ভারত থেকে বিতাড়নের আন্দোলন চলার সময় মুসলমানেরা হিন্দুদের এই বিষয়ে সাহায্য করা দূরে থাক তারা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে মুসলমানপ্রধান এলাকা নিয়ে আলাদাভাবে পাকিস্তান নামে একটি দেশ তৈরি করার আন্দোলন চালাবে। হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলমানদের এই বিষয়ে নিরস্ত হওয়ার অনুরোধ করলে তারা নিরস্ত দূরে থাক বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকিস্তান আন্দোলন আরও তীব্রতর করবে। এবং এদের সঙ্গে যোগ দেবে এই কম্যুনিস্টরা। মুসলমানেরা যে কোনও দাবী আদায় করার জন্য মারমুখী হয়— যাকে এদের শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় জেহাদ, সাধারণ ভাষায় বলে দাঙ্গা। এদের মুখপাত্র দল মুসলিম লিগ কলকাতায় প্রথম বড় মাপের দাঙ্গা শুরু করবে যে দাঙ্গায় ৫,০০০ লোক নিহত হবে। মজার ব্যাপার, এই দাঙ্গায় কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের সঙ্গে একযোগ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করবে। এর পর যখন পাঞ্জাবে মুসলিম লিগ আবার দাঙ্গা করবে— যে দাঙ্গায় কম করে ২০,০০০ লোক নিহত হবে— সেই দাঙ্গায় এরা মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু ও শিখদের উপর আক্রমণ চালাবে। পাকিস্তান তৈরি হলেও এরা নিরস্ত হবে না। এরা ভারতে মুসলমানদের অন্যায় দাবী সমর্থন করবে। এবং ওদের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ভারতে যাতে প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ছোটো ছোটো মুসলিম রাজ্য তৈরি হয় সেজন্য

মুসলমানদের সঙ্গে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

জন্মেজয় বললেন, এদের বৈরিতার কথা শুনে পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করেছিলেন তেমনি এখনি আমার ওদের নিঃশেষ করে দিতে ইচ্ছে করছে।

বৈশম্পায়ন বললেন, এরা এতই হিন্দু-বিদ্বেষী হবে যে হিন্দুরা সামান্য মাত্রায় আত্মরক্ষা করলে বা করতে চাইলে এরা ক্ষিপ্ত হবে, অথচ মুসলমানদের আত্মরক্ষা তথা আক্রমণ করার বিষয়টি পুরোপুরি সমর্থন করবে। হিন্দুরা হিন্দুরাষ্ট্র করার আন্দোলন করলে এরা প্রতিবাদ করবে, 'গেল গেল' রব তুলবে, অথচ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যখন নিজেদের মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে তখন তাদের সমর্থন করবে। এমনকি সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি মেনে নেবে।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কি বিপুল সংখ্যার অধিকারী হবে যে কারণে এদের হিন্দুত্ববাদীরা দমন করতে পারবে না?

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, আপাতত তো নয়। এরা সংখ্যায় সামান্যই হবে কিন্তু এরা অনবরত মারদাঙ্গা, প্রচার ইত্যাদি করে শক্তিবৃদ্ধি করবে। এরা এদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সদা সচেষ্ট থাকবে।

জন্মেজয় বললেন, শুনেছি এরা মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে, ধনী-দরিদ্র, নর-নারীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য প্রাণপাত করবে, জাতিতে জাতিতে বৈরী দূর করার জন্য সংগ্রাম করবে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন হবে এদের লক্ষ্য, এদের মতবাদের নাম নাকি মার্কসবাদ? কোনও এক কার্ল মার্কস নাকি এই মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন? তাঁর মহান আদর্শ থেকে ভারতের মার্কসবাদীরা বিচ্যুত হবে কেন?

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, রাজন, চন্দন বৃক্ষ থেকে কখনও বিষের উদ্ভব হয় না। বিষ বৃক্ষ থেকে বিষই উৎপন্ন হয়। মার্কসের মতবাদ কখনও মহান ছিল না। তাঁর মতবাদ মধ্যযুগীয় এবং বর্বর। এই মতবাদের মূল হলো হিংসা, কাণ্ড হলো অত্যাচার, শাখা-প্রশাখা হলো বিচ্ছেদ, ফল হলো আত্মবিনাশ। হে নরনাথ, সুখের কথা কম্যুনিস্টদের অত্যাচারে ভবিষ্যৎ ভারতের মানুষ যেমন একদিন দিশেহারা হয়ে যাবে তেমনি প্রকৃতির নিয়মে যথাসময়ে এদের বিনাশ হবে।

জন্মেজয়ের মুখমণ্ডল বালসূর্যের মতো উজ্জ্বল হলো। চক্ষুদুটি শিশিরস্নাত সজীব পুষ্পের মতো সুস্মিত হলো। তিনি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মুনিবর, এই মহাভারতে পশুশক্তি কখনও স্থায়ী হতে পারেনি। প্রবল পরাক্রান্ত কুরুবংশ ধ্বংসই এর প্রমাণ।

দিনাজপুরে হিন্দু গ্রামে হামলা
দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরার পর এবার ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হামলায় নিঃস্ব হয়ে গেছে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার হিন্দুপ্রধান রাজাপুর-কবিরাজপাড়া, দক্ষিণ আবদুলপুর-মাঝাপাড়া ও ছোট হাশিমপুর গ্রামের ৫২টি হিন্দু পরিবার। আতঙ্ক ও গভীর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হিন্দুদের পাশে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কার্যকরভাবে দাঁড়ায়নি, যাঁকে তারা সাংসদ নির্বাচিত করেছিলেন বিপুল ভোটে জেতা সেই জনপ্রতিনিধিও হামলার পরদিন দায়সারা সফর করে কর্তব্য সেরেছেন। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়ানো হিন্দুরা অভিযোগ করেছেন— ধর্মান্ধদের এই হামলায় স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিল। হামলা হয়েছে চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতিতেই। সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি। দুই মন্ত্রী কিছু সময়ের জন্যে এলাকা ঘুরে গেছেন, আওয়ামি লিগসহ মহাজোটের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বাস করা হিন্দুদের অবস্থা দেখতে যাননি।

চিরিরবন্দরের বলাইবাজারে মসজিদ নির্মাণের নামে এই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার পটভূমি তৈরি করা হয়। বলাইদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত বলাইবাজারে হিন্দুদের ধর্মীয় একটি স্থানে কয়েকদিন আগে হামিদা বেগম নামে এক মহিলা (যার পরিচিতিতে রাজশাহীর একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যাপিকা বলা হয়েছে) মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে গোটা এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই স্থানটি মহিলা নিজের বলে দাবি করলেও স্থানীয় হিন্দুদের বিশ্বাস, এখানে দীর্ঘদিন আগে একটি কালীমন্দির ছিল। যে স্থানে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে সে স্থানটির আয়তন বড় জোর ১০—১২ ফুট। তার মধ্যে সরকারি রাস্তার একটি অংশও যুক্ত করা হয়েছে। এই স্থানটির মাত্র ২০ গজ দূরে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। ৫০/৬০ গজ দূরে রয়েছে আর একটি মন্দির। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন মুসলমান নেতাও বলেছেন, স্থানটি মসজিদ নির্মাণের জন্যে পর্যাপ্ত ও যথার্থ নয়। দুপাশে দোকান নির্মিত হলেও এই স্থানটি খালি পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। ওই মহিলা হঠাৎ করে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে স্থানীয় হিন্দুরা এখানে মসজিদ নির্মাণে আপত্তি জানান। এর পরই কয়েকদিন ধরে চিরিরবন্দর ও পার্শ্ববর্তী পার্বতীপুর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদে হিন্দুরা বলাই বাজারে মসজিদ স্থাপনে বাধা দিচ্ছে, এই বক্তব্য নামাজের সময় প্রচার করা হয় এবং প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে মসজিদ অবমাননার কথাও বলা হয়। এর মধ্যে চিরিরবন্দর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রশিদুল মান্নাফ কবীর ৩ আগস্ট গভীর রাতে মাইকে উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করে বলাই বাজার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা দেন। তার ঘোষণার ভাষা ছিল, 'কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মসজিদ নির্মাণে বাধা প্রদানে উস্কানি সৃষ্টি হওয়ায় বলাইবাজার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হলো'। সরকারি কর্মকর্তার এই ধরনের উস্কানি ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় এবং পরদিন ৪ আগস্ট সকালে বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা নানা যানবাহন ব্যবহার করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বলাইবাজারে সমবেত হয়। প্রথমে বাজারের কাছে একটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়, এর পরই অদূরে হিন্দু গ্রামগুলোতে ছুটে গিয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। মহিলারা নির্যাতনের শিকার হন, তাদের গা থেকে শাড়ি খুলে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। হামলার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিপুল সংখ্যক পুলিশ নিয়ে উপস্থিত থাকলেও তারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। বরঞ্চ তারা ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের উৎসাহিত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চিরিরবন্দর সম্প্রীতি মঞ্চের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, চিরিরবন্দর উপজেলা চেয়ারম্যান ও দিনাজপুর জেলা জামায়াতের প্রাক্তন আমির আফতাব উদ্দিন মোল্লা, চিরিরবন্দর উপজেলা জামায়েতের আমির লুৎফর রহমান, আবদুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ জামায়াতের আমির মোহাম্মদ সাইদুর রহমান শাহ এবং ওই অধ্যাপিকা হামিদা বেগম এই সাম্প্রদায়িক হামলা সংগঠিত করেছেন। আর প্রশাসনের একাংশ তাদের সহায়তা করেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় আওয়ামি লিগ সাংসদ এ এইচ এম মাহমুদ আলি এবং আওয়ামি লিগের কয়েকটি গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছে ধর্মান্ধরা। এই দ্বন্দ্বের ফলে আওয়ামি লিগের একটি অংশের আচরণ হামলার পক্ষে গেছে, এমন কথাও বলেছেন সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের দিনাজপুর জেলা কমিটির নেতারা অভিযোগ

করেছেন, এক থেকে দেড় সপ্তাহ ধরে এলাকায় মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হলেও প্রশাসন কিংবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনও উদ্বেগ বা শঙ্কা দেখা যায়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জামায়াতে ইসলামির সক্রিয় কর্মী এবং হামলা উস্কে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়ার পরও তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন জেলা প্রশাসক, যিনি আওয়ামি লিগের লোক বলে পরিচিতি রয়েছে। ঘটনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কবীরকে তাৎক্ষণিক সরিয়ে নেয়ার কথা হলেও সে নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে অনেক পরে। জেলা প্রশাসক কেন একজন সক্রিয় জামায়াত কর্মীর পাশে দাঁড়ালেন বোঝা গেল না। এ পর্যন্ত ১৮ জন গ্রেপ্তারের কথা বলা হলেও জানা গেল, তাদের অনেকেই এর মধ্যে জামিন পেয়ে গেছে। অনেক আসামিই এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আক্রান্ত তিনটি গ্রামেরই বাসিন্দা হিন্দুরা অত্যন্ত দরিদ্র। ছোটখাটো ব্যবসা, কৃষি কাজ, দিনমজুরি ও গোরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাড়িঘরগুলোও মাটির, বাঁশের বেড়া কিংবা টিনের তৈরি, বেশির ভাগই শনের ছাউনি। মূল্যবান জিনিষপত্র তেমন কিছু ছিল না। হামলাকারীরা এসব সামগ্রী লুটপাট করে, রান্নার জিনিসপত্র গুঁড়িয়ে দেয়, সামান্য সোনাদানাও ছিনিয়ে নেয়, মহিলাদের গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে উল্লাস করে, প্রতিবাদ করলে মারধোর করে। পরে অনেক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেওয়া হয় খড়ের গাদায়। হামলাকারীরা শুধু গোরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি নয়, তিন গ্রামে যে কয়েকটি নলকূপ ছিল তাও খুলে নিয়ে যায়। হুমকি দিয়ে যায় দেশ ছেড়ে যাওয়ার। অন্তত ২২টি বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। অন্য বাড়িগুলোর বেশ কিছু মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা ধ্বংসের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনে বাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো গাছও পুড়ে গেছে। গ্রামগুলো ঘুরে দেখার সময় কয়েকজন মহিলা জানালেন, তাদের পরার কাপড় ছিল না, কিছু সংগঠন শাড়ি বিতরণ করার পর তারা লজ্জা ঢাকতে পেরেছে। বাচ্চাদের গায়ে দেওয়ার কিছু নেই। উদোম গায়ে বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রান্না করে খাওয়ার থালাবাসনও নেই অনেক পরিবারের। কয়েকজন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, বাবু আমাদের কোনও সাহায্যের দরকার নেই। আমাদের এদেশ ছেড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দিনাজপুর জেলা কমিটি এবং দিনাজপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমন্বয় কমিটি ও জেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো এক আবেদনে চিরিরবন্দরের ঘটনার তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন, বর্বর এই ঘটনায় উস্কানিদাতা চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাশিদুল মান্নাফ কবীর চৌধুরীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা, ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান এবং হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কান্তজীউ মন্দিরের সম্পত্তি থেকে অবিলম্বে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, আগামী নির্বাচন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে সামনে রেখে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা ও দিনাজপুরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সংখ্যালঘু নির্যাতন, মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভেঙে দেওয়া এবং সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি ও দেবোত্তর সম্পত্তি দখল অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

হিন্দুদের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে ভীতি ও অনীহা জন্ম দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে এই হামলার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পার্শ্ববর্তী খানসামা উপজেলায় ভেরভেরি ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামে একটি কালীমন্দিরে হামলা হয়েছে, মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা থেকে নির্বাচিত আওয়ামি লিগ সাংসদ এ এইচ এম মাহমুদ আলি এই হামলার ব্যাপারেও কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেননি বা ঘটনাস্থলে যাননি। জানা গেছে, এই সাংসদ বেশির ভাগ সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় তার পদার্পণ ঘটে কালেভদ্রে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দিনাজপুর জেলার নেতারা জানালেন, এই সাংসদের ছোট ভাই শামীম সম্প্রতি পূজা উদযাপন পরিষদের চিরিরবন্দর শাখার সম্মেলন করতে দেননি। প্রশাসনকে ব্যবহার করে সম্মেলনের আয়োজন পন্ড করে দিয়েছেন।

হামলার মূল উদ্দেশ্য কি?

এলাকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, মসজিদ নির্মাণে হিন্দুদের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এমনটি বলা হলেও মূল কারণ বলাইবাজারের অদূরে (মাত্র ৫০০ গজের মতো) তিন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামের হিন্দুদের জমি ও বাড়িভিটা দখলের লোভ। প্রধান সড়ক ও বাজারের কাছে এই জমির মূল্য অনেক, কালে আরও বাড়বে। তাই এই জমি গ্রাস করার জন্যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। তাদের হিসেব, তিন গ্রামের হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়ে, মহিলাদের নির্যাতন করে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করে তুলতে পারলে ধীরে ধীরে তারা জমিজমা জলের দরে বিক্রি করে ভারতে চলে যাবে, যা সারাদেশে হয়ে আসছে। ছক অনুযায়ী বলাই বাজারে ওই ছোট জায়গায় মসজিদের নাম করে হামলার একটা অজুহাত দাঁড় করানো হয়।

নেতৃবৃন্দ বলছেন, যে তিন গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে তারা আর্থিকভাবে এতোই অস্বচ্ছল যে লুটপাট করে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না, পরিকল্পনাকারীরা তা জানতো। তা সত্ত্বেও হামলা হয়েছে তাদের মধ্যে দেশত্যাগের প্রবণতাকে উস্কে দেওয়ার জন্যে। লুটপাট মুখ্য ছিল না, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে। হিন্দুদের মধ্যে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে, এদেশে থাকলে এরকম হামলার শিকার হতে হবে বারবার। তাই দেশত্যাগ করাই মঙ্গল। □

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

‘ভারত জাগো, বিশ্ব জাগাও’ স্লোগান যথার্থ : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বয়ংসেবকদের বাইক-র‍্যালিকে স্বাগত জানালেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

মঞ্চে বক্তব্যরত স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। রয়েছেন বিশ্বনাথ মুখার্জী ও অরবিন্দ দাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ‘‘একশো উনিশ বছর আগে চিকাগো ধর্মসভায় সনাতনধর্মের পক্ষ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক হিন্দু সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। আগে পাশ্চাত্যের মানুষ ভারতকে অবহেলার চোখে দেখতেন। স্বামীজীর ভাষণে পাশ্চাত্যের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলেন ভারত একটি দেশ, একটি জাতি, তার ঐতিহ্য,সংস্কৃতি ও শ্রেষ্ঠ পরম্পরা।’’ গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে স্বামীজীর পৈত্রিক ভিটায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে সমবেত স্বয়ংসেবকদের ‘আশীর্বচন’ দিতে গিয়ে কথাগুলি বলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর পৈত্রিক ভিটা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। এদিন স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার স্মরণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখা বাইক র‍্যালি-র আয়োজন করেছিল।

কলকাতার তিন দিক থেকে— দক্ষিণে গোলপার্ক, উত্তরে জোড়াবাগান পার্ক ও পূর্বে কাঁকুড়গাছি থেকে তিনটি বাইক র‍্যালি যাত্রা শুরু করে স্বামীজীর বাড়ীতে পৌঁছায়। প্রতিটি র‍্যালিতেই কমপক্ষে ১৫০ জন বাইক আরোহী ছিলেন। সকলের হাতে ছিল স্বামীজীর বাণী ও ছবি সম্বলিত পোস্টার ও গৈরিক পতাকা। কণ্ঠে ছিল স্লোগান— ভারত মাতা কী জয়, হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অমর রহে ইত্যাদি। ছিল স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে ট্যাবলোও।

উপস্থিত স্বয়ংসেবক সমাবেশের একাংশ। — ছবি : বাসুদেব পাল

ভগিনী নিবেদিতাকে উদ্ধৃত করে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ আরও বলেন, চিকাগো ভাষণের আগে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবারে তা পরিপূর্ণ রূপ পেল। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের বিষয়ে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত তিনি করেছিলেন। এই দিনটি তাই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। স্বয়ংসেবকদের পোষাকে লেখা ‘ভারত জাগো, বিশ্ব জাগাও’ স্লোগান তাই যথার্থ।

সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ও স্বামীজীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর সংযোজক (পশ্চিমবঙ্গ) অরবিন্দ দাস বলেন, চিকাগো ভাষণে স্বামীজী যে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন তা সনাতন ধর্মের, হিন্দুত্বের। হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। স্বয়ংসেবকেরা প্রতিদিন শাখায় প্রার্থনায় এই ভাবনারই স্মরণ-মনন করে। আগামী ২০১৩-র ১১, ১২, ১৩ জানুয়ারি কল্যাণীর বিবেকানন্দ যুবশিবিরে স্বয়ংসেবকরা স্বামীজীর এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবে।

কলকাতা মহানগরের সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ‘হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামীজী’র প্রতিকৃতি স্বল্পমূল্যে বিতরণের জন্য স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে অনুরোধ জানান।

রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির দিকে রাজ্য সরকারের নজর নেই কেন?

গোপীনাথ দে

সবজির বাজারে আগুন লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন সবজি বাজারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজার ঘুরে দেখলেন; আর পরেরদিনই দুই থেকে তিন টাকা (প্রতি কেজিতে) দাম কমে গেল। আর আমরা সুধী বঙ্গজনেরা বাহবা দিলাম।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা দপ্তর আছে যার নাম 'নিয়ন্ত্রিত বাজার'। সাবেক জমিদারদের আমলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত হাজার হাট বা বাজার ছিল। এইসব হাট বা বাজারগুলিতে সপ্তাহে দুদিন কেনা বেচার ব্যবস্থা থাকত বা দুদিন হাট বসত। জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার পর এইসব হাট বা বাজারগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন। এইসব বাজারগুলিতে কৃষকরা বা সবজি উৎপাদকরা নিজেরা সবজি এনে খুচরো ক্রেতাদের বিক্রি করতে পারে বা ফোড়েদের বা ডালাওয়ালাদের বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে পারে। ডালাওয়ালারা বাজারে বা হাটে বসে খুচরা ক্রেতাদের বিক্রি করে। এইসব ফোড়েরা বা ডালাওয়ালারাই সবজির বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের উপর প্রধান ভূমিকা পালন করে। এর ফলে চাষিরা বা সবজি উৎপাদকরা ক্ষেত্র বিশেষে লাভজনক দাম পায় না বা সামান্য লাভে সবজি দিয়ে দিতে হয়। অপরদিকে খুচরা ক্রেতাদের ক্ষেত্র বিশেষে অত্যধিক বেশি মূল্যে ক্রয় করতে হয় শাকসবজি।

এইসব হাটগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আসার পর চাষিদের সমস্যা ও খুচরো ক্রেতাদের সমস্যা সব দেখেশুনে একটা সমাধানের পথে অগ্রসর হন। এবং সমাধানের একটা রূপরেখা রচনা করেন; এবং সেটাই হলো নিয়ন্ত্রিত বাজার। এখন পর্যন্ত সরকার পশ্চিবঙ্গের সব হাট বা বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারে রূপান্তরিত করতে পারেননি। যতদূর জানা গেছে ২৪১টি নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং এক একটি নিয়ন্ত্রিত বাজারের অধীনে পাশাপাশি আরও সাত/আটটি হাট বা বাজারকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই ভাবে যোগ করতে করতে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিধি বৃদ্ধি করতে করতে পশ্চিমবঙ্গের সব হাট বা বাজারগুলিকেই নিয়ন্ত্রিত বাজারের অধীনে আনা হবে। নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতি জেলায় কয়েকটি করে চালু করলেও প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত বাজারের যে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল; পশ্চিমবঙ্গে কোনও একটি বাজারকেও পূর্ণাঙ্গরূপে রূপায়িত করা আজও হয়নি।

খুচরো ক্রেতারা নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রধান প্রবেশ পথেই প্রবেশ করার সময় বাজারের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া সমস্ত সবজির সেইদিনের মূল্য তালিকা দেখে নিতে পারবেন। এই মূল্য তালিকা নির্ধারণের জন্য একটি বাজার কমিটি থাকবে। সেই বাজার কমিটিতে কৃষক, ডালাওয়ালা, খুচরা ক্রেতা ও সরকারের প্রতিনিধি থাকবেন। ওই বাজার কমিটি সবদিক বিচার বিবেচনা করে, কৃষক যাতে লাভজনক দাম পায় এবং খুচরা ক্রেতাদের পক্ষে যেন অধিক চাপ না পড়ে ও সর্বোপরি ডালাওয়ালারা যেন লাভের মুখ

দেখতে পায়; এইসব বিবেচনা করে ওই মূল্য তালিকা নির্ধারিত হওয়ার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনও নিয়ন্ত্রিত বাজারে এমন সবজির মূল্য তালিকা দেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি বা দেখিনি।

নিয়ন্ত্রিত বাজারে মিনি কোল্ডস্টোর থাকবে। অবিক্রিত মাছ, দুধ, দই ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য; যাতে করে পরেরদিন সেগুলিকে বিক্রি করা যায়। মিনি গো-ডাউন থাকবে— অবিক্রিত অন্যান্য সবজি রাখার জন্য। এমন কি কৃষক এবং ডালাওয়ালাদের সুবিধার্থে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও থাকবে নিয়ন্ত্রিত বাজারে। কৃষক বা ডালাওয়ালারা তাদের যে সব মাল বিক্রি হলো না, তখন তারা ওই মাল বাজারের গোডাউনে রেখে যেতে পারবে। এবং বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকা ওই কৃষক বা ডালাওয়ালাদের প্রয়োজন হলে এবং অল্প কয়েকদিনের জন্য ধার নিতে পারবে। এইসব ভাবনা চিন্তা করেই নিয়ন্ত্রিত বাজারের রূপরেখা রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বাজার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলিকেও প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রিত বাজারে রূপান্তরিত করা হয়নি। কেবলমাত্র পার্টি কর্মীদের (ক্যাডার) কিছু সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যদি মাঝে মাঝে বাজারে হাজির হন তাহলেও সাময়িকভাবে দু-একটাকা দামের হেরফের হতে পারে; তার জন্য স্থায়ী সমাধান হবে না। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে যেকটি ঘোষিত নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে সেগুলিকে পরিপূর্ণ রূপে, রূপদান করে চালু করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট হাট ও বাজারগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত বাজারে রূপান্তরিত করতে হবে।

জমিদার আমলে যে সাত হাজার হাট বা বাজার ছিল; বর্তমানে ওই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে। আজকাল তো রাস্তার মোড়ে, বাসস্ট্যান্ডের পাশে, এমনকি ফুটপাতেও বাজার বসছে। এসব বাজার হিসাব করলে সাত হাজার নয় বরং একুশ হাজার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানকার সব বিক্রেতা বা ডালাওয়ালাদের সকলকেই নিয়ন্ত্রিত বাজারের অধীনে আসতে হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গের এই সবজি ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে তখন আর মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারে বাজারে ঘুরতে হবে না। তখন রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই সব কাজ হয়ে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। উনি তো এক বছরেই নাকি পাঁচ বছরের কাজ করে ফেলেছেন! তবে কৃষি দপ্তরের এই বিষয়টির প্রতি অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির দিকে নজর দিচ্ছেন না কেন? ▯

জমিদার আমলে যে সাত হাজার হাট বা বাজার ছিল; বর্তমানে ওই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে। আজকাল তো রাস্তার মোড়ে, বাসস্ট্যান্ডের পাশে, এমনকি ফুটপাতেও বাজার বসছে। এসব বাজার হিসাব করলে সাত হাজার নয় বরং একুশ হাজার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানকার সব বিক্রেতা বা ডালাওয়ালাদের সকলকেই নিয়ন্ত্রিত বাজারের অধীনে আসতে হবে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপির মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

নেত্রদান মহাদান

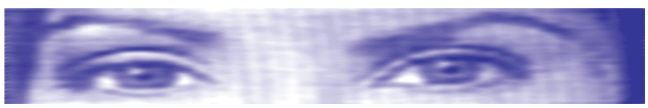

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণে

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা গত ২৬ আগস্ট স্থানীয় রবীন্দ্র সদনে স্বামী বিবেকানন্দ

ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— এই দুই মনীষীকে স্মরণ করল নৃত্য ও সঙ্গীতাঞ্জলির মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে সংগঠনের ভাবসঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অমল

সমাবেশ সমাচার

চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সংস্কার ভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু। পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী শাখার সভানেত্রী বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী।

সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণে মঞ্চ পরিচালনা করেন স্বাধীন ধর। শাখার শিল্পী সদস্যাদের পরিবেশিত সমবেত দ্বিজেন্দ্রগীতি দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। ভিডিও এবং সঙ্গীত সহযোগে শাখা সম্পাদিকা মৌমিতা বিষ্ণু'র পরিচালনায় নৃত্যার্পণ 'কবি ও সন্ন্যাসী' অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা সংযোজনা করে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বন্দেমাতরম গীত পরিবেশন করেন ভবানন্দ ঘোষ।

মোমিনপুরে পালাগান

মোমিনপুর বারোয়ারী সমিতির উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে মোমিনপুর বিন্দুবাসিনী শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে 'নীলমাধবের আবির্ভাব' পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরটি বাংলা ১২৫৮ সালে স্থাপিত হয়। হাঁসুরী পাগলা বাবার আশ্রম থেকে আসা কৃষ্ণদাস ও তার সম্প্রদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মরণে সভা

গত ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর রথীন্দ্রমঞ্চে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্মরণে এক সভা হয়ে গেল। গত ১৫ আগস্ট সুধীন্দ্রনাথবাবুর জীবনাবসান হয়। ক্যানিং-এর বঙ্কিম সর্দার কলেজের তিনি ছিলেন প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সহ-সভাপতি। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন ক্যানিং তথা সুন্দরবন অঞ্চলের শিক্ষা জগতকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ছাত্র তৈরির কাজে। ক্যানিং নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকেও তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা

হয়েছিল। দুটি অনুষ্ঠানেই তাঁর প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষানুরাগী বহু বিশিষ্টজন ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিচারণা, গান ও কথায় বিভিন্নজন তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শোকসংবাদ

খড়গপুর শহরের দুর্গা গুপ্তার মাতৃদেবী গৌরীদেবী গুপ্তা (৮৫) গত ১৫ আগস্ট দেহত্যাগ করেছেন। দশপুত্র, দুই কন্যা সহ নাতি- নাতনীরা রয়েছেন। পরিবারের প্রায় সবাই স্বয়ংসেবক। খড়গপুরের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি মাতৃসমা ছিলেন।

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

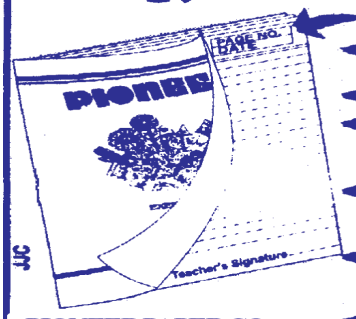

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

নেহরু কাপ জয় একটা পরিবর্তনের সূচনা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরপর তিনবার দিল্লীর মাঠে নেহরু কাপ জিতল ভারত। ২০০৭, ২০০৯-এ কাপজয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া। আর সদ্য সমাপ্ত নেহরু কাপ ফেডারেশনের সদর দফতর ফুটবল হাউসে শোনা যাচ্ছে বাইচুঙের ভাবশিষ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বগুণ ও ব্যক্তিগত দক্ষতার কথা। সুনীলই এই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। তবে সুনীলকে যোগ্য সঙ্গত করেছেন রহিম নবি, ক্লিফোর্ড মিরান্ডা, গৌরমাঙ্গি সিং, আর অবশ্যই শেষ দুর্গের অতন্দ্রপ্রহরী সুব্রত পাল। এই ফুটবলাররা দক্ষতার শীর্ষে উঠে পারফর্ম করেছেন। তাই ক্যামেরুনের মতো ফিফা র‍্যাঙ্কিং-এ অনেক এগিয়ে থাকা দলকেও বশ্যতা স্বীকার করানো গেছে। যতই ক্যামেরুন তাদের দ্বিতীয় দল নিয়ে আসুক না কেন, বিশ্ব ফুটবলে গত এক দশকে যে সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে, তাতে 'বি টিমও' ভারতের তুলনায় যথেষ্ট ওজনদার প্রতিপক্ষ। আর এই টিমে তাদের অলিম্পিক খেলোয়াড় ছিল ২/৩ জন। তাহলে আন্তর্জাতিক স্তরে মোটামুটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দলই বলতে হবে।

ক্যামেরুন আর সিরিয়া ছাড়া তেমন শক্তিশালী দল ছিল না এবারের নেহরু কাপে। তাই এই জয় নিয়ে আনন্দে আটখানা হবার মতো কিছু নেই। শুধু বলা যেতে পারে ক্যামেরুনকে হারিয়ে ট্রফি জয় ভারতীয় ফুটবলারদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের বাড়তি উদ্দীপনা জোগাবে যে আমরাও বিশ্বমানের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকেও বশ মানাতে পারি। এই ভাবটাই একাল ও পরবর্তীকালের জাতীয় স্তরের ফুটবলারদের কাছে মোটিভেশন এনে দেবে বড় কিছু করে দেখাবার। পরিবর্তনের এই দিকচিহ্নটা ধরে রাখতে হবে দেশের ফুটবল কর্তাদের। তারজন্য জাতীয় কোচ কোভারম্যান্সের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে কর্তাদের। ফেডারেশনের একটা ভাল কাজ হচ্ছে এদেশের ফুটবলে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ও কোচ দুই পদে আনা হয়েছে দুই প্রখ্যাত ডাচ ব্যক্তিত্বকে। রব বান ও উইথ কোভারম্যান্স জুটি ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যেসব পরিকল্পনা করেছেন, তা যদি ফেডারেশন বাস্তবে রূপায়িত করে বা করার সদিচ্ছা দেখায় তাহলে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ হবে এদেশের ফুটবল।

কোভারম্যান্স তার পরিকল্পনায় বলেছেন শুধু জাতীয় দল নয়, দেশের সব প্রথম সারির ক্লাব দলগুলি সব টুর্নামেন্টে ডাচপদ্ধতিতে পাসিং অ্যান্ড পজেশনাল ফুটবল খেলুক। একই সিস্টেম

সুনীল ছেত্রী

সুব্রত পাল

ও ট্যাক্টিক্স মেনে খেলুক। আর স্কুলস্তর বা সব জুনিয়র স্তরের ফুটবলাররাও সেই মডেলে খেলে বেড়ে উঠুক। তার জন্য সব স্তরের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদেরও কোচিং দরকার। সেই প্রয়োজনীয় কোচিং ম্যানুয়াল তৈরি করবেন রব বান। ডাচ ঘরানার ফুটবলই খেলছে এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, ক্লাব। বব হাউটনের কোচিংয়ে ভারত পূর্ববর্তী দুটি নেহরু কাপ ও এশিয়ান চ্যালেঞ্জ কাপ জিতলেও বিদেশের মাঠে মুখ থুবড়ে পড়েছে বারে বারে। একে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট নামেমাত্র খেলে ভারতীয়রা, তারপর যাওবা খেলে, বিদেশে হলে বিধ্বস্ত হয়ে ফেরে। এজন্যই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত। বান-কোভারম্যান্স চান ভারতীয় দল অন্তত বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলুক বছরে ২/৩টি। আর এশিয়ার শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে বছরে ৫/৬ বার খেলার সুযোগ পাক। তাহলে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়বে ভারতীয় ফুটবলারদের। ফেডারেশন ও সব রাজ্য সংস্থার কর্তাদের পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফুটবল প্রশাসন চালানো উচিত বলে তারা মনে করেন। খেলোয়াড়দের টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়ানোটা কোচেদের যেমন দায়িত্ব তেমনি কর্তাদের উচিত সেই দক্ষতার যেন যথাযথ প্রতিফলন ঘটে। তারজন্য দেশে-বিদেশে ভাল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত করতে হবে কর্তাদের। তার সঙ্গে সংগঠন বা প্রশাসনকে চালাতে হবে সুসংহতভাবে। আর দেশ জুড়ে ভাল পরিকাঠামো ও অ্যাকাডেমি গড়ে তুলতে হবে। তারজন্য বহুসংখ্যক কর্পোরেট সংস্থাকে জড়িত করতে হবে। এই নেহরু কাপে সাফল্যের রেশ যেন বুদবুদের মতো মিলিয়ে না যায়। যে তরঙ্গটা উঠেছে তা ধরে রাখতে হবে। না হলে হাউটনের আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। যতই দেশের মাঠে সাধারণ মানের টুর্নামেন্টে সেরা কিন্তু বিদেশে গেলে লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা থাকে না। এই ঘটনার পরিবর্তন যাতে হয় তারজন্য ডাচ কোচ জুটির কথামতো কাজ করা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে বান, কোভারম্যান্সের উজ্জ্বল অতীত রেকর্ডের কথা। দুজনেই বিশ্ববিখ্যাত কোচ কাম বিশেষজ্ঞ রেনাস মিশেলের হাতে তৈরি। হল্যান্ডের মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে হিসেবে জড়িয়ে ছিলেন। আর কোভারম্যান্স তো ১৯৮৮-তে ইউরোকাপ জয়ী ডাচ দলের অন্যতম সদস্যও ছিলেন। এহেন অসামান্য ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পন্ন দুই কোচকে এনে তাদের কথামতো কাজ না হলে ভারতীয় ফুটবল আরও পিছিয়ে যাবে। জাতীয় লিগকে আরও কর্পোরেটমুখী ও জনপ্রিয় করতে হবে। যে জনপ্রিয়তা প্রথম কয়েক বছর ছিল তা আজ আর নেই কর্তাদের ব্যর্থতায়। তার সঙ্গে ফুটবলে উন্নত রাজ্যগুলির লিগ ফুটবল কাঠামোটিকেও শক্তিশালী করতে হবে। এই সমন্বয়টা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ ক্লাব ফুটবলের গঠনতন্ত্র বা কাঠামো মজবুত হলে জাতীয় ফুটবলের সাপ্লাই লাইন ও সাংগঠনিক বুনিয়াদ উন্নত হবে। যেমনটা হয়েছে বান, কোভারম্যান্সের দেশ হল্যান্ডে বা ইউরোপের সব দেশে। ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে কাজ করলে ভারতীয় ফুটবল বিশ্বে না হোক অন্তত এশিয়ার মধ্যে সম্মানজনক অবস্থান নিতে পারে তা কিন্তু ফিফা মনে করে। আর তার জন্যই ফিফা ভারতের দিকে বাড়তি নজর দিয়েছে। ডাচ কোচ প্রেরণ থেকে এ আই এফ এফের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী গাঁটছড়া স্থাপন তারই প্রতিফলন।

শব্দরূপ-৬৪১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

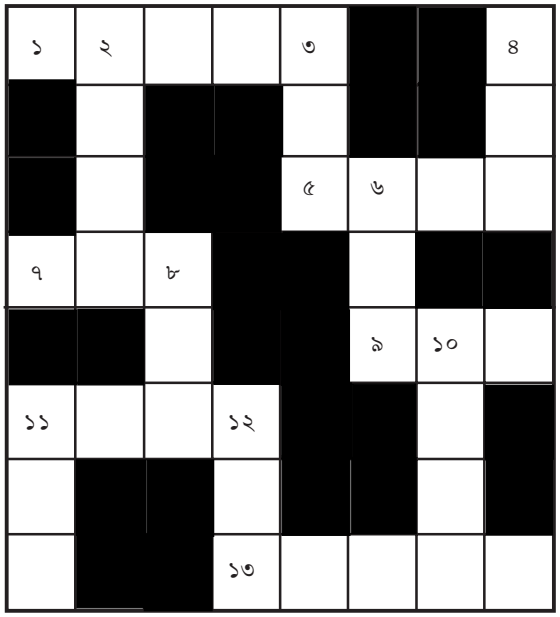

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মহাভারতপ্রবক্তা ব্যাস-শিষ্য ঋষিবিশেষ, **৫.** চড়ুই পাখি, **৭.** শাখামৃগ, **৯.** দাবি করিবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম, **১১.** চন্দ্র, **১৩.** হিন্দি ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা সাধক কবি।

উপর-নীচ : ২. গৌতম ঋষির পুত্র, **৩.** মৃত পাপী যেখানে শাস্তিভোগ করে, **৪.** পালঙ্ক, খাট, **৬.** রাধিকার সখী, **৮.** রুদ্রবীণা, **১০.** বিপ্লবী সূর্য সেন যে নামে অধিক পরিচিত, **১১.** দুর্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা; কর্ণহীন, **১২.** তাড়কা রাক্ষসীর জনক।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	নী	তি	ন	■	অ	■	■
■	■	থি	■	■	প	দ	বি
কা	■	ক্ষ	পা	ক	র	■	ন্দু
ম	ল	য়	■	ম্বু	■	■	বা
ধ্ব	■	■	ফাঁ	■	পা	ন	সি
ং	■	বি	কি	কি	নি	■	নী
সী	স	ক	■	■	ফ	■	■
■	■	ট	■	গ	ল	তি	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৪১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ অক্টোবর, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। ~~*উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*~~

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১৩

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

--: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়— রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। **তিলকের প্রথম কারাবরণ : শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। **রাষ্ট্রপরিচালনায় 'খড়ের মানুষের' উপদ্রব**— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। **বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ**—তথাগত রায়। **ভারত বনাম ইন্ডিয়া**— অমলেশ মিশ্র। **গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন**— দেবীপ্রসাদ রায়। **বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদর্শন ও জাতীয়তাবোধ**— অচিন্ত্য বিশ্বাস। **রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা**— সমিত দে। **আন্দামান দর্শন**— দীনেশ চন্দ্র সিংহ। **রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** — সত্যনারায়ণ মজুমদার। **রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শতবর্ষ : দেশে দেশে ডাকঘর**— বিকাশ ভট্টাচার্য। **সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা**— সন্দীপ কুমার দাঁ। **বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা**— অর্ণব নাগ। **মাধেরার সূর্যমন্দির**— সৌমেন নিয়োগী।

--: গল্প :—

রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

--: রম্যরচনা :—

ধামালি— চণ্ডী লাহিড়ী। **ডি লা গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক ইয়াক**— পিনাকপাণি ঘোষ।

--: ভ্রমণ :—

সিন্ধু দর্শনে— বিজয় আঢ্য।

--: দেবীবন্দনা :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী— ভিক্ষুদেব ভট্ট

সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
17 September - 2012

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা